ইসলামী উত্তারাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

ইসলামী উত্তারাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ

[হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থা]

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

প্রকাশনায় ঃ
কাঁটাবন বুক কর্ণার
ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লেখকের বক্তব্য

সমস্ত প্রশংসা পরম দয়ালু, করুণাময় ও বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের জন্যে যিনি আমাকে "ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ" নামক বইটির পান্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করার তৌফিক দান করেছেন। আদর্শ মহামানব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর দুরুদ ও সালাম পেশ করছি।

বিশ্বনবী (সাঃ) ফরমায়েছেন-

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ .

অর্থাৎ তোমরা ফারায়েজ শিক্ষাগ্রহণ কর এবং উহা মানুষদেরকে শিক্ষা দাও, কেননা এ জ্ঞান হচ্ছে (এলমে শরীয়াতের) অর্ধেক।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে বন্টন করে দেয়ার জ্ঞানকে এলমে ফারায়েজ বলা হয়। ফারায়েজ অর্থাৎ মিরাস বন্টন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই জ্ঞান লাভ করা উচিত। কারণ, এতে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন হলেন অতি দয়ালু ও মেহেরবান। তাঁর মত ইনসাফকারী আর কেউ নেই। তিনি ন্যায়বান ও ইনসাফের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং তাদের অংশের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বর্তমানে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ইসলাম বিদ্বেষী এক শ্রেণীর নারী ও পুরুষ ইসলামের বিভিন্ন আইনের সমালোচনা করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীদের অবহেলা করা হয়েছে ও ঠকিয়েছে। নারীদের অধিকার প্রদান করা হয়নি। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনকে সংশোধন করার জন্যে তাঁরা ইতিমধ্যে দাবীও জানিয়ে আসছেন। অথচ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীকে দেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ অধিকার। কিন্তু এ সম্পর্কিত তথ্য বহুল ভাল বইয়ের সংখ্যা বর্তমান বাজারে খুবই কম। ফলে নারীগণ ইসলাম প্রদত্ত তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারছেন না। এ সুযোগে তথাকথিত নারী মুক্তিবাদীগণ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে নারী জাতিকে ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরানোর হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত একটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করি এবং দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে 'ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ' নামক বইটি লিপিবদ্ধ করি। এ বইটিতে আমি উত্তরাধিকার আইন এবং মিরাস বন্টনের পদ্ধতি সংক্রান্ত

বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারী জাতিকে যে শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করা হয়েছে তার যুক্তিযুক্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বিভিন্ন অবস্থাভেদে পুরুষদের অংশ প্রাপ্য এবং পরিমাণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকার সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাগণ যাতে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও অনুধাবন করতে পারেন সে জন্যে এ বইটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনে নারীর করুণ অবস্থার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া উত্তরাধিকার আইন বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তথাকথিত ইসলাম বিদ্বেষী নারীমুক্তিবাদীগণের বিভিন্ন বক্তব্যের যুক্তিসংগত জবাবও দেয়া হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন আলোচনার শেষে ইসলামী আইন ও হিন্দু আইনে নারীর অধিকার ও অবস্থার সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনাও করেছি, যাতে পাঠক পাঠিকাগণ উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন করতে পারেন। আমি আশা করি এ বইটির মাধ্যমে সর্বস্তরের পাঠক পাঠিকাগণ উপকৃত হবেন এবং উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। যারা ফারায়েজ অর্থাৎ ইসলামী উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে লেখাপড়া ও গবেষণা করেন, তাদের জন্যে এ বইটি বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমার প্রত্যাশা। ইসলামের প্রতি যাদের বিদ্বেষমূলক মনোভাব রয়েছে তারাও ইচ্ছে করলে এ বইটির মাধ্যমে হেদায়াতের পথ লাভ করতে পারবেন। সর্বস্তরের পাঠক পাঠিকাগণ যাতে বইটি পড়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমি বইটি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। যদি কোন পাঠক পাঠিকা এ বইটির মাধ্যমে বিন্দু মাত্রও উপকৃত হন, তাহলেই আমি আমার এ পরিশ্রমকে স্বার্থক বলে মনে করব।

এ বইটির পান্ডুলিপি তৈরীতে আমার সহধর্মিণী মাহমুদা রহমান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। আমার পরম শুভাকাঙ্খি, ইসলামের একজন একনিষ্ঠ কর্মী এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার অতন্দ্র প্রহরী জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার এ বইটি প্রকাশনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পরম করুণাময় আল্লাহপাক যেন সবাইকে উভয় জাহানে এর উত্তম পুরস্কার দান করেন।

পরিশেষে প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার নিকট আমার অনুরোধ, বইটিতে কোন ভুল ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে, যদি তা আমাকে অবহিত করা হয় তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ

		পৃষ্ঠা নম্বর
১।	আইয়্যামে জাহেলিয়াতে নারীর অবস্থা	১১
২।	উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ	১৩
৩।	ইসলামী আইনের উৎস	২০
৪।	মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে প্রাথমিক হকসমূহ	২২
৫।	উত্তরাধিকারীগণের প্রকারভেদ	২৩
৬।	উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার বাঁধাসমূহ	২৫
৭।	অংশের পরিমাণ নির্ধারিত আছে যাদের	২৬
৮।	নারীর অধিকারের মূল্যায়ন ও জবাব	২৭
৯।	স্বামীর অংশ	২৯
১০।	পিতার অংশ	২৯
১১।	বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অংশ	৩০
১২।	দাদার অংশ	৩১
১৩।	স্ত্রীর অধিকার	৩১
১৪।	মূল্যায়ন ও জবাব	৩৩
১৫।	কন্যা সন্তানের অধিকার	৩৭
১৬।	উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব আত্মসাৎকারীদের প্রতি হুশিয়ারী	৩৯
১৭।	পুত্র কেন কন্যার দ্বিগুণ পায়ঃ জবাব ও মূল্যায়ন	৪৩
১৮।	১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ	৪৮
১৯।	পৌত্রীর অধিকার	৫১
২০।	পুত্রের বর্তমানে পৌত্র পৌত্রীদের বঞ্চিত হবার কারণ	৫৭
২১।	এতীম পৌত্র পৌত্রীদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা	৫৮
২২।	১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের কুফল	৬০
২৩।	সহোদর বোনের অধিকার	৬২
২৪।	বৈমাত্রেয়া বোনের অধিকার	৬৫
২৫।	বৈপিত্রেয়া বোনের অধিকার	৭০
২৬।	মাতার অধিকার	৭৩
২৭।	মূল্যায়ন ও জবাব	৭৫
২৮।	দাদীর অধিকার ও মুল্যায়ন	৭৭

পৃষ্ঠা নম্বর

২৯। আসাবাগণের বর্ণনা ৮০
৩০। ওয়ারিশগণের মধ্যে অংশ বন্টনের নিয়ম ৮২
৩১। আ'উল নীতি ৮৫
৩২। রদ্দ নীতি ৮৮
৩৩। অংশ বন্টন শুদ্ধিকরণ নীতি ৯২
৩৪। মুনাসেখা ১০০
৩৫। কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় ১০৩
৩৬। গর্ভস্থিত সন্তানের অংশ ১০৯
৩৭। নপুংসক ব্যক্তির অংশ ১১০
৩৮। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অংশ ১১০
৩৯। জারজ সন্তানের অংশ ১১১
৪০। দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের অংশ ১১১
৪১। কয়েদীর অংশ ১১১
৪২। মুরতাদের অংশ ১১২
৪৩। যাবিল আরহামগণের বর্ণনা ১১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থা

৪৪। হিন্দু আইন ১১৫
৪৫। দায়ভাগ পদ্ধতি ১১৬
৪৬। মিতাক্ষরা পদ্ধতি ১১৮
৪৭। হিন্দু আইনে নারীর অবস্থা ১২০
৪৮। উত্তরাধিকারীত্বে যাদের অগ্রাধিকার ১২৩
৪৯। ইসলাম ও হিন্দু আইনে নারীর তুলনা ১২৮
৫০। বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন ১৩৬
৫১। বৌদ্ধ আইনে নারীর অবস্থা ১৩৯
৫২। খৃষ্টান আইনে নারীর অবস্থা ১৪১

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

		পৃষ্ঠা নম্বর
৫৩।	কন্যার মর্যাদা ও অধিকার	১৪৬
৫৪।	স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার	১৫১
৫৫।	বহু বিবাহ ও তালাক	১৫৮
৫৬।	মাতার মর্যাদা ও অধিকার	১৬৩

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ

আইয়্যামে জাহেলিয়াতে নারীর অবস্থা

আইয়্যামে জাহেলিয়াতে নারী জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করা তো দূরের কথা, তাদের কোন সামাজিক মর্যাদাও ছিল না। তৎকালীন আরববাসী নারীদেরকে অস্থাবর সম্পত্তি, সকল অপকর্মের হোতা এবং ভোগের সামগ্রী বলে মনে করত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে বলে সংবাদ পেলে পিতার মুখমন্ডল দুঃখে বিবর্ণ হয়ে যেত। কখনো কখনো পিতা তার কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। কন্যার হৃদয় বিদারক চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হলেও, পিতার হৃদয়ে একটুও মায়া মমতার উদ্রেক হত না। পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করত। তৎকালীন যুগে নারী জীবনের যে অবস্থা ছিল, তার কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১। একজন লোক স্বীয় ইচ্ছামত যত খুশী স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছামত যে কোন মুহূর্তে যে কোন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিত। আবার যখন খুশী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনত। ফলে অত্যাচারী স্বামীদের কবল থেকে স্ত্রীদের মুক্তি পাবার কোন পথ ছিল না। এভাবে নারীদের বিবাহিতা জীবনে সুখ শান্তির পরিবর্তে নেমে আসত অশান্তি ও গ্লানি।

২। ঘরে একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যে কোন পুরুষ অন্যান্য প্রণয়নীর সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। এতে স্ত্রীদের প্রতিবাদ করার কোন অধিকার ছিল না।

৩। স্বামীরা মনে না চাইলে স্ত্রীদের সাথে দৈহিক সম্পর্কও স্থাপন করত না এবং তালাকও দিত না। নারীরা বন্দী জীবন যাপন করত এবং এভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হত।

৪। স্বামীরা স্ত্রীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত। কখনো কখনো জোরপূর্বক স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত এবং এর মাধ্যমে স্বামীরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করত।

৫। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র তার বিমাতাকে বিয়ে করত। মাতা হিসেবেও নারীকে সামান্যতম মর্যাদাটুকু পর্যন্ত দিত না।

৬। তৎকালীন যুগে কুমারী রমণীদের বিয়ে দেবার কয়েকটি প্রথা চালু ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল, মেয়েকে বিয়ে দেবার সংবাদ যদি প্রচার করা হত, তাহলে বিভিন্ন পুরুষ এসে ঐ মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হত। এরপর তার

পছন্দ হলে বিয়ে করত নতুবা করত না। নারীদের সতীত্ব, আত্মমর্যাদা কিংবা কোন প্রকার অধিকার ছিল না। নারীদের এ ধরনের ঘৃণিত ও অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তির পথ ছিল কেবলমাত্র একটাই, তা হল মৃত্যু।

৭। পোষ্যপুত্র অর্থাৎ কেহ যদি অন্যের সন্তানকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে লালন পালন করত, তাহলে তাদের একজন অন্যজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত। অথচ কন্যা সন্তান পিতার ঔরষে জন্মলাভ করেও মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হবার অধিকার ছিল না।

৮। মৃত স্বামী, পিতা বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতেও নারীর কোন অধিকার ছিল না।

৯। স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা নিজেদেরকে স্ত্রীরও ওয়ারিশ অর্থাৎ মালিক বলে মনে করত। ইচ্ছে হলে নিজেই তাকে বিয়ে করত, ভোগ করত অথবা অন্যের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে বিয়ে দিয়ে দিত। এক কথায় নারীদেরকে অস্থাবর সম্পত্তি এবং ভোগের সামগ্রী বলে মনে করত।

১০। স্ত্রী যদি কোনভাবে কিছু সম্পদের মালিক হত যেমন বাবা মা ও আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী থেকে প্রাপ্ত উপঢৌকন, তখন এটাও স্ত্রী ভোগ করতে পারত না বরং স্বামীই নিয়ে নিত।

১১। স্ত্রীর তেমন কোন দোষ না থাকলেও স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে দোষারোপ করত, কষ্ট দিত, নির্যাতন করত। কিন্তু তালাকও দিত না, যাতে করে স্ত্রী মোহরানার টাকা ফেরত দিয়ে দেয় অথবা মাফ করে দেয়। যে সকল নারীদের ব্যক্তি মালিকানায় প্রচুর ধন সম্পদ ছিল, তারা স্বামীকে টাকা পয়সা দিয়ে অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তালাক নিয়ে নিত। কিন্তু এতেও তারা সুখের পরশ লাভ করতে পারেনি। সর্বত্রই ছিল তারা অবহেলিতা, ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা ও অত্যাচারিতা। এ দূর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নারী জাতি কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিল। আইয়্যামে জাহেলিয়াতে নারী জাতির যখন এ অবস্থা, তখন বিশ্বনবী (সাঃ) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে নারী জাতিকে তাদের এ দূর্বিষহ জীবন থেকে উদ্ধার করতঃ পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাতৃত্বের আসনেই প্রতিষ্ঠিত করেননি, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রেও তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কারা পাবে এবং কতটুকু অংশ পাবে তা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ধনদৌলত মানুষের চিরস্থায়ী সম্পদ নয়। কোন ব্যক্তি যত অর্থেরই মালিক হউক না কেন, মৃত্যুকালে সে কোন সম্পদই সংগে নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমল এবং খোদা ভীতিই হল মানুষের স্থায়ী সম্পদ, যার মাধ্যমে সে পরকালে চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারবে। দুনিয়ার কেবল সুখ শান্তি এবং ধন সম্পদ লাভ করা মুসলমানদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে পরকালের শান্তি লাভ করাই হল আসল উদ্দেশ্য। ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ 'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ।'

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিছু সম্পদকে বান্দাদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ীভাবে ভাগ করে দিয়েছেন, কেবলমাত্র পৃথিবীতে ভোগ করার জন্যে। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন, কারা আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং তাঁর আইন ও বিধি নিষেধ মেনে চলে, আর কারা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং ধন সম্পদকে ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে বলে, কোন ব্যক্তি তার ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক হয়ে যায়নি। উদাহরণ স্বরূপ একজন বাস ড্রাইভার বাসের মালিকের চেয়ে অধিক সময় বাসে চড়ে থাকেন এবং বাসটি মালিকের চেয়ে ড্রাইভারের অধীনেই অধিক সময় থাকে। কিন্তু তাই বলে, ড্রাইভার বাসের প্রকৃত মালিক হতে পারেন না। বাস মালিকেরই থেকে যায়। তদরূপ মানুষ ধন সম্পদকে ভোগ করে বলে সে ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়। তার মৃত্যুর পর

ধন সম্পদ আল্লাহরই রয়ে যায়। যেহেতু ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ, সেহেতু কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ধন সম্পদ কারা কতটুকু অংশ ভোগ করতে পারবে, এ সম্পর্কিত আইন তৈরী করে দেবার অধিকারও রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। তাই আল্লাহ্ পাক নিজেই পবিত্র কোরআনে ইনসাফের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং তাদের অংশের পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। খোদায়ী আইনের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা সবচেয়ে বেশী ন্যায়বান। তার সাথে কোন তুলনা নেই। তিনি আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে পবিত্র কোরআনের ৪র্থ সুরা, সুরা-নিসার সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, তেত্রিশ এবং একশত ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে নিজেই উত্তরাধিকার আইন তৈরী করে দিয়েছেন, যা নিম্নে পেশ করা হলঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ٥

১। অর্থাৎ 'পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হউক বা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।'

(সুরা-নিসা, আয়াত নং ৭)

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ٥

২। অর্থাৎ 'আর প্রত্যেক ধন-সম্পত্তির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায়; আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্ব বিষয় পরিজ্ঞত আছেন।

(সুরা-নিসা, আয়াত-৩৩)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج
فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ
وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ
لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ
بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ
اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৩। অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাবার) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান পাবে, আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই এর অধিক হয়, তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে; আর একটি মাত্র কন্যা থাকলে পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতামাতা অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্যে $\frac{১}{৬}$ অংশ, আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে মাতার প্রাপ্য $\frac{১}{৩}$ অংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাইবোন থাকে, তাহলে মাতা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ, এ সকল মৃত ব্যক্তির অছিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকার সাধনে অধিক নিকটবর্তী, তা তোমরা অবগত নও। এটি আল্লাহর বিধান নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'

(সূরা- নিসা, আয়াত নং ১১)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ
وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗ

أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوْٓا
أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّوْصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ٥

৪। অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ তোমাদের জন্যে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে; আর যদি স্ত্রীগণের কোন সন্তান থাকে তবে তোমরা পাবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ। এটা তারা যে অছিয়ত করে যায়, তা আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ; এ সকল তোমাদের কৃত অছিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ। তারা যদি তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে তারা সকলে একত্রে $\frac{১}{৩}$ অংশের অংশীদার হবে। এটা কৃত অছিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর; এ শর্তে যে, কারো ক্ষতি না করে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।'

(সুরা- নিসা, আয়াত নং ১২)

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا
هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج
وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا
وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৫। অর্থাৎ '(হে নবী) লোকে আপনার নিকট (উত্তরাধিকারের) বিধান জিজ্ঞেস করে; আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন (সহোদর বা বৈমাত্রেয়া) বোন থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি (বোন মারা যায় এবং) তার কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয়, তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। আর যদি ভাইবোন উভয় থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ঠ হবে এ আশংকায় আল্লাহ তা'য়ালা (তার বিধান) তোমাদের জন্যে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত।'

(সুরা- নিসা, আয়াত-১৭৬)

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٥

৬। অর্থাৎ 'এ নির্দেশাবলী আল্লাহর বিধান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ বেহেস্তসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।'

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথা অমান্য করবে এবং তাঁর বিধানসমূহ সম্পূর্ণরূপে লংঘন করে চলবে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে এবং তার এরূপ শাস্তি হবে, যাতে লাঞ্ছনাও রয়েছে।'

(সুরা– নিসা, আয়াত–১৩ এবং ১৪)

ইসলামী আইনের উৎস

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের উৎস হল মোট ৪টি। যথা-

১) আল কোরআন, ২) হাদিস (সুন্নাহ), ৩) ইজমা এবং ৪) কিয়াস।

১) আল কোরআনঃ

উত্তরাধিকার আইনসহ সকল আইনের প্রথম, প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস হল আল কোরআন। এটা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল দিক নিয়ে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে আলোচনা করেছেন। যেহেতু বিশ্বনবী (সাঃ) এর মাতৃভাষা ছিল আরবী, তাই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনকে আরবী ভাষায় নাজিল করেছেন। আরবী ভাষার এক একটি শব্দ এত অর্থবোধক ও সুদূর প্রসারী যে, এটাকে আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করতে হলে একটি আরবী শব্দের জন্যে একাধিক শব্দ, এমনকি বহু বাক্যও ব্যবহার করতে হয়। আরবী ভাষার এক একটি শব্দ যেন ভাবের পাহাড়। তাই ইসলামী আইনবিদগণ আইন রচনার ক্ষেত্রে অনেক আরবী শব্দকে আধুনিক ভাষায় প্রকাশ না করে আরবী শব্দই ব্যবহার করেছেন। ইসলামী আইন তৈরীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনের কোন একটি আয়াত বা আয়াতের অংশকে অনুসরণ করলেই হবে না বরং সমস্ত কোরআনকে অনুসরণ করতে হবে। একই বিষয়ে বিভিন্ন আয়াতের সাথে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। পবিত্র কোরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হাদিস (সুন্নাহ) কে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, কারণ হাদিস হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা।

২) হাদিস বা সুন্নাহঃ

ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদিস বা সুন্নাহ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের সকল কথা, কর্ম, অনুমোদন, সম্মতি ও অসম্মতি জ্ঞাপনের সমাহারকে বলা হয় সুন্নাহ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনে প্রায় সকল বিষয়েই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং যে সকল বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি, সে সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই সুন্নাকে অনুসরণ করতে হবে। সুন্নাহর সাহায্য

ব্যতীত আইন রচনা করার পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, ধর্মীয় আচার আচরণেও সুন্নাহ ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অফাতের পর যে সকল মামলা মোকদ্দমা পেশ হত, তা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সর্বপ্রথমেই পবিত্র কোরআনের আশ্রয় নেয়া হত। যদি পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন আইন খুঁজে পাওয়া না যেত সেক্ষেত্রে অনুরূপ মামলা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন আদেশ, রায়, অভিমত কিংবা ইংগিত দিয়েছেন কিনা তা বিবেচনা করা হত এবং তারই ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তি করা হত। সুতরাং হাদিস (সুন্নাহ) হচ্ছে নিঃসন্দেহে আইনের দ্বিতীয় উৎস।

৩) ইজমাঃ

ইজমার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঐক্যমত। কোন বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানে মুজতাহিদগণ যদি ঐক্যমত হন, তখনই একে ইজমা বলা হয়। ইসলামী আইন হচ্ছে একটি খোদায়ী আইন। এতে মানব রচিত আইনের কোন স্থান নেই। মুজতাহিদগণ নিজেদের মনগড়া কোন আইন তৈরী করেননি। আইন তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁরা পবিত্র কোরআন ও হাদিসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে এমন অসংখ্য আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ রয়েছে, যা এ ইংগিত বহন করে যে, কোন বিষয়ে আল্লাহর আইনকে অনুসরণ করে আল্লাহর আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন রচনার দায়িত্ব মানব সমাজের। সুতরাং মুজতাহিদগণ যদি কোন বিষয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিংবা নীরবতা জ্ঞাপন করেন তখনই এটা হয় ইজমা। ইজমা হচ্ছে ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস।

৪) কিয়াসঃ

নতুন কোন সমস্যায়, পুরাতন সমস্যার সমাধানকে প্রবর্তন করাই হচ্ছে কিয়াস। ফকীহ অর্থাৎ ইসলামী আইনবিদগণের অভিমত হল এ যে, পবিত্র কোরআন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিস এবং ইজমায় যে আইন রয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। সে সকল কারণ যদি নতুন কোন সমস্যায় বিদ্যমান থাকে তাহলে সে আইনকে নতুন সমস্যায় প্রবর্তন করতে হবে। কিয়াস হচ্ছে ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস।

মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে প্রাথমিক হকসমূহ

কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করার পূর্বে নিম্নলিখিত হকগুলো আদায় করতে হবে।

১) মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হতে সর্বপ্রথম তার কাফন দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে কোনরূপ কৃপণতা অথবা অপব্যয় করা যাবে না।

২) অতঃপর মৃত ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে তার ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধ করা হবে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর দেনমোহর যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ অপরিশোধিত থাকে, তাহলে তাও পরিশোধ করা হবে। মৃত ব্যক্তির ঋণ এবং স্ত্রীর মোহর যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা বেশী হয়, তাহলে কেউই উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব পাবে না বরং পরিত্যক্ত সম্পত্তি দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৩) ঋণ এবং স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হতে মৃত ব্যক্তির অছিয়ত (যদি থাকে) আদায় করা হবে। পরকালে ছওয়াব পাবে এ বিশ্বাসে কোন ব্যক্তি যদি জীবিতাবস্থায় কাউকে কিছু দান করে যায়, তাহলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে অছিয়ত বলা হয়। উল্লেখ্য যে, কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে অছিয়ত করা ইসলামী আইনে বৈধ নয়। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী নয়, এমন ব্যক্তির জন্যে অছিয়ত করা ইসলামী আইনে বৈধ, কিন্তু সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পত্তির অছিয়ত করতে পারবে না। যদি কেউ বেশী সম্পদের অছিয়ত করে যায়, তাহলে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্তই বৈধ হবে। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির মাধ্যমে যতটুকু অছিয়ত আদায় করা সম্ভব হবে, ততটুকুই আদায় করা হবে, এর বেশী নয়।

উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার পর মৃত ব্যক্তির অবশিষ্ট স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ইসলামী আইন মোতাবেক মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

উত্তরাধিকারীগণের প্রকারভেদ

উত্তরাধিকারীগণ মোট তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) যাবিল ফুরুজ (অংশীদার), (২) আসাবা (অবশিষ্টাংশ ভোগী ও (৩) যাবিল আরহাম (দূর সম্পর্কিয় আত্মীয় স্বজন)।

১) যাবিল ফুরুজ (অংশীদার)ঃ

পবিত্র কোরআন শরীফে যে সকল উত্তরাধিকারীগণের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে অথবা সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা যাদের অংশ প্রমাণিত রয়েছে, তাদেরকে যাবিল ফুরুজ বলা হয়। যেমন- পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্যা, বোন ইত্যাদি।

২) আসাবা (অবশিষ্টাংশ ভোগী)ঃ

যাবিল ফুরুজ বর্তমান থাকাবস্থায় তাদের নির্ধারিত অংশ পাবার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি যারা পায় এবং যাবিল ফুরুজ বর্তমান না থাকলে যারা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয় তাদেরকে আসাবা বলে। যেমন- পুত্র, ভ্রাতা, চাচাত ভাই ইত্যাদি। আসাবাগণের বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তীতে করব ইনশাআল্লাহ।

৩) যাবিল আরহাম (দূর সম্পর্কিয় আত্মীয় স্বজন)ঃ

রেহেম শব্দের বহুবচন হল আরহাম। রেহেম স্ত্রীলোকদের গর্ভাশয়কে বলা হয়। রেহেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়তার বন্ধনকে বলা হয় যাবিল আরহাম। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় যাবিল ফুরুজ এবং আসাবার অবর্তমানে যারা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করে তাদেরকে বলা হয় যাবিল আরহাম। যেমন- দৌহিত্র, দৌহিত্রী, ভাগিনা, ভাগিনী, খালা, ফুফু ইত্যাদি। যাবিল আরহাম সম্পর্কে আরো আলোচনা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

সম্পত্তি বন্টনের ধারাবাহিকতাঃ

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করার সময় সর্বপ্রথম যাবিল ফুরুজদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করতে হবে। যাবিল ফুরুজদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবাগণের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্টন করতে হবে। যদি আসাবাগণের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকে তাহলে উক্ত সম্পত্তি আবার যাবিল ফুরুজগণের প্রতি রদ করতে হবে। অর্থাৎ যাবিল ফুরুজগণের মধ্যে তাদের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী পুনরায় বন্টন করে দিতে হবে। যাবিল ফুরুজ এবং আসাবাগণের মধ্যে কেউ যদি জীবিত না থাকে তাহলে যাবিল আরহামগণ উত্তরাধিকারী হবে; যাবিল আরহামগণের অবর্তমানে উত্তরাধিকারী হবে মাওলাল মুয়ালাত। পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভালবাসার উপর ভিত্তি করে জীবিত অবস্থায় একে অন্যকে মিরাছ দেয়ার কথা ঘোষণা করলে উহাকে মাওলাল মুয়ালাত বলা হয়। তাদের অবর্তমানে উত্তরাধিকারী হবে নছব স্বীকৃত ব্যক্তি। এদের অবর্তমানে উত্তরাধিকারী হবে ঐ সমস্ত লোক, যাদের জন্যে মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পত্তি প্রদানের অছিয়ত করে গিয়েছে। এ ধরনের অছিয়ত প্রাপ্ত কেউ যদি না থাকে তাহলে সর্বশেষ উক্ত সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার বাঁধাসমূহ

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নিম্নলিখিত কারণে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়। এ সকল কারণসমূহ পুরুষের মধ্যে হউক না নারীর মধ্যে। যথা–

১। দাসত্বঃ মৃত ব্যক্তি যদি আযাদ হয় এবং তার কোন ওয়ারিশ যদি গোলাম বা দাস হয় তাহলে ঐ গোলাম ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না। এছাড়া ঐ গোলাম মৃত প্রভুর সম্পত্তিও দাবী করতে পারে না। বর্তমানে এ দাস প্রথা নেই। বিশ্বনবী (সাঃ) দাস আযাদ করার মাধ্যমে পৃথিবীর বুক থেকে দাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেছেন।

২। হত্যাঃ যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে তিনি যদি খুন হয়ে মারা যান এবং এ খুনের জন্যে যদি মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিশ দায়ী হয় এবং কেছাছ অর্থাৎ প্রতিহত্যা বা কাফফারা ওয়াজিব হয় তাহলে ঐরূপ ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না।

৩। ধর্মের পার্থক্যঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে পরস্পরের আত্মীয়তা থাকলেও কেউ কারোর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না। মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিশ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় বা অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ঐরূপ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব হতে বঞ্চিত হবে।

৪। কে আগে এবং কে পরে মৃত্যুবরণ করেছে, তা জানা না থাকাও উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব হতে বঞ্চিত হবার অন্যতম কারণ। যেমন– একই পরিবারের কয়েকজন লোক লঞ্চ কিংবা বাসে ভ্রমণ করছিল। দুর্ঘটনায় পড়ে সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু কে আগে এবং কে পরে মৃত্যুবরণ করেছে তা জানা যায়নি। এক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে সকলেই একই সময়ে মারা গিয়েছে। এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তিদের একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব হতে বঞ্চিত হবে। নিহতের সম্পত্তি জীবিত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে যথারীতি বন্টন করা হবে।

৫। সৎ মাতা ও সৎ পুত্র কন্যাঃ সৎ মাতা সৎ পুত্র কন্যার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। অনুরূপভাবে সৎ পুত্র কন্যাও সৎ মাতার উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব হতে বঞ্চিত হবে।

অংশের পরিমাণ নির্ধারিত আছে যাদের

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনে যাদের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে কিংবা ইজমা বা কিয়াসের দ্বারা যাদের অংশ প্রমাণীত রয়েছে তাদেরকে যাবিল ফুরুজ বলা হয়। যাবিল ফুরুজদের জন্যে পবিত্র কোরআনে মোট ৬টি অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা– $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ।

এ ছয় প্রকার অংশের জন্যে পবিত্র কোরআনে যাবিল ফুরুজ হিসেবে মোট ১২ জনকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে পুরুষ হল মাত্র ৪ জন, এছাড়া বাকী ৮ জনই হল নারী।

৪ জন পুরুষঃ

১) পিতা,
২) দাদা (পিতার পিতা),
৩) বৈপিত্রেয় ভাই,
৪) স্বামী।

৮ জন নারীঃ

১) স্ত্রী,
২) কন্যা,
৩) পোত্রী (পুত্রের কন্যা),
৪) সহোদর বোন,
৫) বৈমাত্রেয়া বোন (Consanguine sister),
(সৎ মায়ের গর্ভজাত সন্তানদেরকে বৈমাত্রেয়া ভাইবোন বলা হয়)
৬) বৈপিত্রেয়া বোন (Utrine sister),
(মা একজনই কিন্তু পিতা দুইজন অর্থাৎ মায়ের পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদেরকে বৈপিত্রেয়া ভাইবোন বলা হয়।
৭) মাতা,
৮) দাদী (পিতার মাতা)।

নারীর অধিকারের মূল্যায়ন ও জবাব

নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণ অভিযোগ করেন যে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নাকি নারীদের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি, তাদেরকে অবহেলা এবং হেয় করা হয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষীদের এ অভিযোগ খন্ডন করে আমি বলব, ওয়ারিশগণের উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে মাত্র ৪ জন পুরুষের অংশ নির্ধারিত আছে। অপরদিকে নারীর সংখ্যা হচ্ছে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮ জন। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। কন্যা সন্তান যে রকমভাবে পিতামাতা থেকে জন্মলাভ করেছে, তদ্রূপ পুত্র সন্তানেরও জন্মদাতা হলেন পিতামাতাই। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক কন্যার অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন অথচ পুত্রের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। পবিত্র কোরআনে কারোর অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া নিঃসন্দেহে সম্মানজনক ব্যাপার। মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিশ থাকুক আর নাই থাকুক, কন্যার নির্দিষ্ট অংশ সে পাবেই। অপরদিকে সবাই আগে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু পাবে পুত্র। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক নারীর অধিকার ও মর্যাদাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা থাকে, তাহলে বলা হয়েছে–

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ـ

(এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ)।

অর্থাৎ পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাবে। এখানে পুত্রের অংশকে কন্যার অংশের উপর ভিত্তি করা হয়েছে। কিন্তু কন্যার অংশকে পুত্রের অংশের উপর ভিত্তি করা হয়নি। একথা বলা হয়নি যে, কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাবে। পুত্রের অংশ কমবেশী পাওয়া আর না পাওয়ার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে পুত্রের চেয়ে কন্যার অধিকার ও মর্যাদাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী আইনে সহোদর বোনের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু সহোদর ভাইয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বৈমাত্রেয়া এবং বৈপিত্রেয়া বোনদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, অপরদিকে

বৈমাত্রেয়া ভাইয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, শুধুমাত্র বৈপিত্রেয়া ভাইয়ের অংশ নির্দিষ্ট আছে। অথচ ভাইবোন পিতামাতা থেকেই এসেছে। এস্থলে এটাই প্রমাণীত হয় যে, ইসলাম উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী তথা মাতার দিক দিয়ে সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছে। এছাড়া ভাইয়ের অংশের ব্যাপারে বোনের অংশকেই আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কথা বলা হয়নি যে, বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। বরং বলা হয়েছে, বোন যা পাবে, ভাই তার দ্বিগুণ পাবে। ভাইয়ের পাওয়া আর না পাওয়া নির্ভর করবে বোনের পাওয়া আর না পাওয়ার উপর। এখানেও ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও মর্যদাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম নারী জাতিকে দিয়েছে তাদের অধিকার এবং মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে যা মানব রচিত কোন আইন বা ধর্ম দিতে পারেনি।

পুরুষ নারীর দ্বিগুণ অংশ পাবে। এর একটি যৌক্তিকতা অবশ্যই রয়েছে। পুরুষকে যদিও দ্বিগুণ অংশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভবান হচ্ছে নারীই। এ ব্যাপারে কন্যার অধিকারের স্থলে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এখানে এতটুকুই বলব যে, সম্পদ কখনো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। সম্পদ ও সম্মান দু'টি ভিন্ন জিনিস। ধনবানকে মানুষ ভয় করতে পারে কিন্তু ধন সম্পদের মালিক হলেই কেউ তাকে সম্মান করে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, একজন কবি, সাহিত্যিক কিংবা দার্শনিক এর মাসিক আয় ৮ হাজার টাকা। অপরদিকে একজন বাস ড্রাইভার কিংবা দোকানদারের মাসিক আয় ১২ হাজার টাকা। এখানে মর্যাদা কার বেশী? ড্রাইভার কিংবা দোকানদারের নিশ্চয়ই নয়। একজন কবি বা সাহিত্যিকের সম্পদ যতই কম থাকুক না কেন, মানুষের নিকট তাঁরই সম্মান তুলনামূলক বেশী। সম্পদের মাধ্যমে কখনো প্রকৃত মর্যাদা লাভ করা যায় না। সুতরাং যারা নিজেদেরকে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীদার বলে মনে করেন, তাঁদের উচিত শুধুমাত্র সম্পদকে মর্যাদার আসল মাপকাঠি বলে সাব্যস্ত না করা। ইসলাম নারীদেরকে কোন অবস্থাতেই অবহেলা বা হেয় দৃষ্টিতে দেখেনি। একমাত্র ইসলামই দিয়েছে নারীর অধিকার ও মর্যাদা। বর্তমানে ইসলামী অনুশাসন মেনে না চলার কারণে এবং দেশে ইসলামী আইন চালু না থাকার কারণেই নারী জাতি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীর অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একমাত্র প্রয়োজন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে পুরুষদের অংশ সম্পর্কেও আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন অবস্থাভেদে পুরুষ এবং নারীর অংশের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনার মধ্যেই ফুটে উঠবে কার অধিকারের প্রশ্নটিকে ইসলামে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই নিম্নে বিভিন্ন অবস্থাভেদে পুরুষদের অংশ প্রাপ্তি এবং এর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। কিন্তু এক্ষেত্রে উদাহরণ পেশ করা আমি প্রয়োজন মনে করিনি।

স্বামীর অংশ

মৃতা স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে স্বামীর দুই অবস্থা। যথা–

১। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি না থাকে, তাহলে স্বামী মৃতা স্ত্রীর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

২। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান সন্ততি অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি থাকে তাহলে স্বামী পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ।

পিতার অংশ

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে পিতার তিন অবস্থা। যথা–

১। মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র বা তনিম্নের কেউ জীবিত থাকে, তাহলে পিতা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ।

২) মৃত ব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী ইত্যাদি থাকলে পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে এবং আসাবাও হবে। অর্থাৎ কন্যা, পৌত্রী এবং অন্যান্য যাবিল ফুরুজগণ অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পিতা পাবে।

৩। মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান সন্ততি অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তদনিম্নের কেউ না থাকলে, পিতা শুধু আসাবা হবে অর্থাৎ অন্যান্য যাবিল ফুরুজগণ অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সম্পূর্ণ পিতা পাবে।

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অংশ

পিতা দুইজন কিন্তু মাতা একজন হলে অর্থাৎ মাতার অন্য স্বামীর পুত্র সন্তানকে বৈপিত্রেয় ভাই বলে। এরূপ ভাইয়ের অংশ পাবার তিন অবস্থা। যথা–

১। বৈপিত্রেয় ভাই মাত্র একজন হলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

২। বৈপিত্রেয় ভাই দুই বা ততোধিক হলে, সবাই মিলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে এবং উক্ত অংশ বৈপিত্রেয় ভাইদের মধ্যে সমান সমানভাবে ভাগ করা হবে।

৩। মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র এবং তদনিম্নের কেউ বর্তমান থাকলে অথবা পিতা কিংবা দাদা জীবিত থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই কোন অংশ পাবে না।

মূল্যায়নঃ উপরোক্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাইয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তাদেরকে আসাবা হিসেবে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সবাই অংশ নেয়ার পর যদি কোন সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাহলে তারা পাবে, নতুবা বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে যাদের অংশ নির্ধারিত আছে, তারা তাদের নির্ধারিত অংশ পাবেই। সুতরাং কারোর অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া কী তাদের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়া নয়?

বৈমাত্রেয় ভাই অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভে জন্মলাভ না করার কারণে তাকে যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অপরদিকে বৈপিত্রেয় ভাই অর্থাৎ পিতা এক নয় কিন্তু একই মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করার কারণে বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের অংশের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণীত হয় যে, ইসলাম নারী জাতিকে শুধুমাত্র মাতৃত্বের মর্যাদাই প্রদান করেনি বরং মাতৃত্বের মর্যাদাকে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সুতরাং উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম নারীর অধিকারকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে।

দাদার অংশ

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ লাভের ব্যাপারে দাদার চার অবস্থা। যথা–

১। মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র বা তনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে দাদা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ।

২। মৃত ব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী বা তনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে দাদা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে এবং আসাবাও হবে। অর্থাৎ অন্যান্য যাবিল ফুরুজগণ তাঁদের অংশ নেয়ার পর কোন সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে তা দাদা পাবে।

৩। মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান সন্ততি না থাকে, যেমন– পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি তাহলে দাদা শুধুমাত্র আসাবা হবে। অর্থাৎ অন্যান্য যাবিল ফুরুজগণ তাঁদের অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সম্পূর্ণ দাদা পাবে।

৪। মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে দাদা কোন অংশ পাবে না।

স্ত্রীর অধিকার

স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে স্বামীর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে স্ত্রীর দুই অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থাঃ মৃত স্বামীর যদি কোন সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে।

যেমন– মরহুম খালেদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং পিতা রেখে গেছেন।

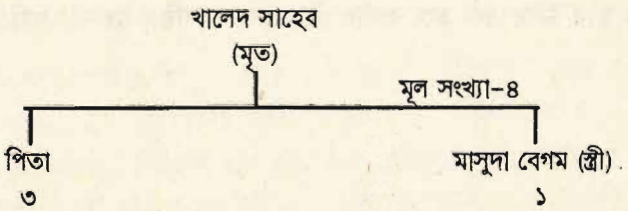

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী মাসুদা বেগম পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং

পিতা পাবে $\frac{৩}{৪}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃত স্বামী যদি মৃত্যুকালে পুত্র, কন্যা অথবা তনিম্নের কাউকে জীবিত রেখে যান, তাহলে স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ।

যেমন– খালেদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং এক পুত্র রেখে গেছেন।

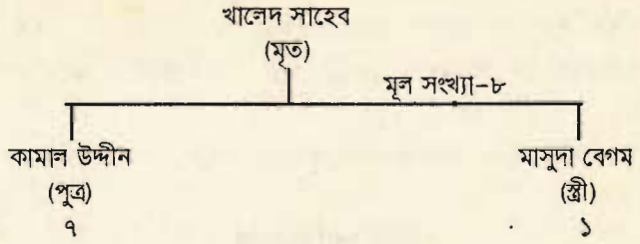

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী মাসুদা বেগম পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং

পুত্র কামাল উদ্দিন পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ।

* মৃত স্বামীর যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে হানাফী মাজহারের পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামগণের (ইসলামী আইনবিদগণের) মতে দেশে শরয়ী বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত না থাকলে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

মূল্যায়ন ও জবাব

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণ বলেন, উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম নাকি স্ত্রীদেরকে ঠকিয়েছে। এ ধরনের উক্তি তাঁদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান শূন্যতারই বহিঃপ্রকাশ। উপরোল্লিখিত বন্টন ব্যবস্থায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও দেখা যাচ্ছে যে, অন্যদের তুলনায় স্ত্রীর অংশের পরিমাণ কম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বন্টন ব্যবস্থায় স্ত্রীই হচ্ছে লাভবান। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ স্বামীর কোন সন্তান না থাকলে স্ত্রী পাচ্ছে $\frac{১}{৪}$ অংশ। ইতিপূর্বে বিবাহের সময় স্ত্রী মোহরানার অর্থ পেয়েছেন যা অন্যেরা পায়নি। বৈবাহিক সূত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সুখ শান্তি ও আনন্দ ভোগ করে থাকে। কিন্তু ইসলাম স্বামীকে সামান্যতম মোহরানা দেবার জন্যেও স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়নি। বরং স্বামীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে মোহরানা দেবার জন্যে। এটা ফরজ। স্ত্রীকে অবশ্যই দিতে হবে। স্ত্রী ইচ্ছে করলে তার মোহরানার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবেন এবং এর লাভ স্ত্রীরই থাকবে। এতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এখানে ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এরপর স্ত্রীকে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীও বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে যে মোহরানার টাকা পেয়েছেন তা সম্পূর্ণই জমা থাকার কথা, কারণ স্ত্রীর নিজের জন্যে মোহরানার অর্থ থেকে খরচ করার কোন প্রয়োজন হয়নি। স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সবকিছুর ব্যয় বহনের দায়িত্ব ছিল স্বামীর উপর। স্বামী যদি জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর মোহরানার অর্থ পরিশোধ না করে থাকেন, তাহলে সে অর্থও স্ত্রী পাবেন। ইসলামী আইনে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করার পূর্বে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করারও বিধান রয়েছে। এ অর্থ পরিশোধ হবে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে। এছাড়া স্ত্রী তার পিতা, মাতা, ভাই ও বোনদের থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাবেন। এমতাবস্থায় স্ত্রীর মোহরানার অর্থ, মৃত স্বামী থেকে প্রাপ্য $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং অন্যান্যদের থেকে প্রাপ্য অংশ মিলিয়ে মোটা অংকের মালিক হতে পারছেন। সবকিছুর পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যাবে অন্যান্যদের তুলনায় তার সম্পদ কম নয় বরং বেশী। স্ত্রী হিসেবে একজন নারীকে এ অধিকার দিয়েছে ইসলাম। প্রথম অবস্থায় স্ত্রীর যেহেতু কোন সন্তান নেই, কাজেই স্ত্রী যদি ইচ্ছে করেন স্বামীর বাড়ীতেই বসবাস করার, তাহলে

তিনি স্বীয় সম্পদ দিয়ে অন্যদের তুলনায় স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারবেন। স্বামীর বাড়ীতে বসবাসকালে মৃত স্বামীর পিতামাতা, ভাইবোন এবং স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের ভরন পোষণ ও মেহমানদারীর দায়িত্ব ইসলাম স্ত্রীকে দেয়নি। এ সকল দায়িত্ব অন্যদের উপর বর্তিয়েছে। স্ত্রীর এ স্বাধীনতা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আইন দিতে পারেনি। স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়ীতে বসবাস না করে বাপের বাড়ীতে চলে যায়, তাহলে সে স্বাধীনতাও ইসলাম দিয়েছে। বাপের বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পদ বাপের বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনদের পিছনে ব্যয় করতে হবে এ নির্দেশও ইসলাম স্ত্রীকে দেয়নি। এ সময় স্ত্রীর ভরণ পোষণের সকল দায়িত্ব পিতার। কন্যা যদি বিধবা হয়ে পিতার নিকট ফিরে আসে, তাহলে কন্যার সকল দায় দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে ইসলাম পিতাকে নির্দেশ দিয়েছে। এমতাবস্থায়ও স্ত্রীর সম্পদের কোন অংশ খরচ করার প্রয়োজন হচ্ছে না। সবই জমা থাকছে। অন্যদিকে পুরুষ ওয়ারিশদের সম্পদ জমা রাখার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাদেরকে অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার ইচ্ছে করে তাহলে সে অধিকারও ইসলাম স্ত্রীকে দিয়েছে। এতে স্ত্রী মৃত স্বামীর উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে না। স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থেকেও তিনি মোহরানা পাবেন। এছাড়া অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ তো পাবেনই।

উপরন্ত, দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর স্বীয় সম্পদের কোন অংশই খরচ হচ্ছে না বরং যাবতীয় ব্যয় অন্যদের থেকেই পাচ্ছেন। এটা তাঁর অধিকার ও মর্যাদা। এর চেয়ে বেশী মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম ছাড়া আর কে দিতে পেরেছে?

দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ স্বামীর যদি সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী পাচ্ছেন $\frac{১}{৮}$ অংশ। উদাহরণ স্বরূপ মরহুম খালেদ সাহেব পুত্র কামাল উদ্দিন এবং স্ত্রী মাসুদা বেগমকে রেখে মারা গেলেন। এ অবস্থায় স্ত্রী মাসুদা বেগম পাচ্ছেন $\frac{১}{৮}$ অংশ। এখানেও ইসলাম স্ত্রীকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ করেনি। যেহেতু খালেদ সাহেবের পুত্র কামাল উদ্দিন জীবিত রয়েছে, যিনি মাসুদা বেগমেরও পুত্র। কাজেই এ অবস্থায়ও স্ত্রী মাসুদা বেগমের আর্থিক কষ্ট হবার কোন কথা নয়। মা হিসেবে

মাসুদা বেগমের সেবা যত্নসহ যাবতীয় দায়িত্ব হচ্ছে পুত্র কামাল উদ্দিনের। মায়ের সেবাযত্ন করা আল্লাহ্ পাক সন্তানের জন্যে ফরজ করে দিয়েছেন। সুতরাং পুত্র কামাল উদ্দিন যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তার কর্তব্য হল, মাতা মাসুদা বেগমের সেবাযত্ন ও ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে মাসুদা বেগমের মোহরানার অর্থ, স্বামী হতে প্রাপ্য $\frac{১}{৮}$ অংশ সম্পত্তি এবং অন্যান্য প্রাপ্য অংশ সবই জমা থাকছে। যাবতীয় খরচ পাচ্ছেন পুত্র কামাল উদ্দিন থেকে। পক্ষান্তরে কামাল উদ্দিন বাহ্যিক দৃষ্টিতে অধিক অংশ পেলেও তার সিংহ ভাগ চলে যাচ্ছে মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের পিছনে। কারণ তার দায়িত্ব অনেক বেশী। সুতরাং কামাল উদ্দিনের প্রাপ্য সম্পদ জমা রাখার কোন সুযোগ নেই। এছাড়া সন্তান থাকা অবস্থায়ও মাসুদা বেগম ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। সে অধিকারও ইসলাম তাঁকে দিয়েছে। স্বামীর যদি অন্য কোন ওয়ারিশ জীবিত না থাকে তাহলে স্ত্রীই স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবেন। সুতরাং এ কথা যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণীত হচ্ছে যে, উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে ঠকায়নি বরং অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করেছে।

স্ত্রীর দ্বিগুণ সম্পত্তি পায় স্বামী। অর্থাৎ স্ত্রী যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পায় স্বামী। অপরদিকে স্বামী যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৪}$ অংশ। ইসলাম বিদ্বেষী তথাকথিত নারী মুক্তিবাদীগণ এক্ষেত্রেও অভিযোগ করে বলেন, ইসলাম নাকি স্বামীর তুলনায় স্ত্রীকে ঠকিয়েছে। এ প্রসংগে আমি বলব, এক্ষেত্রে স্ত্রী যদিও স্বামীর তুলনায় অর্ধেক পায় তথাপি স্ত্রী স্বামীর তুলনায় বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্থ নয়। এ স্থলে স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর মোহরানা ও ভরণ পোষণের ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। এছাড়া পিতামাতা ও ভাইবোনদের ভরণ পোষণের জন্যেও তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অপরদিকে স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থেকেও তিনি মোহরানাসহ যাবতীয় খরচাদি পাবেন। যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী না হন তাহলে বাপের বাড়ীতে চলে গেলে তিনি যাবতীয় খরচাদি পাবেন পিতার নিকট থেকে। আর যদি স্বামীর বাড়ীতেই থেকে যান তাহলেও শ্বশুর শ্বাশুড়ী

কিংবা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের জন্যে কোন অর্থ খরচ করতে তিনি ইসলামী আইনে বাধ্য নন। সুতরাং $\frac{১}{৪}$ অংশ সম্পত্তি, মোহরানার অর্থ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্য সম্পত্তি শুধুমাত্র নিজের জন্যে তুলনামূলকভাবে কম নয়। অপরদিকে স্বামীর $\frac{১}{২}$ অংশ সম্পত্তি দ্বিতীয় বিবাহ কিংবা নিজের এবং পিতামাতা ও ভাইবোনদের ভরণ পোষণের জন্যে তুলনামূলকভাবে খুবই সামান্য। এক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে $\frac{১}{৪}$ অংশ পেয়ে থাকলেও তার প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ কিংবা কিয়দাংশ জমা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে $\frac{১}{২}$ অংশ পেয়েও তার দায়িত্ব অধিক হবার কারণে তার প্রাপ্য সম্পদের কোন অংশ জমা রাখার সুযোগই নেই।

এছাড়া স্ত্রীর যদি সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্বামী পায় $\frac{১}{৪}$ অংশ। অপরদিকে স্বামীর যদি সন্তান থাকে তাহলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৮}$ অংশ অর্থাৎ স্বামীর তুলনায় অর্ধেক। এক্ষেত্রেও ইসলাম প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে ঠকায়নি। এ অবস্থায়ও সন্তান থাকার কারণে স্ত্রী তার যাবতীয় খরচাদিসহ সেবাযত্ন পাবেন সন্তানদের থেকে এবং স্ত্রীর প্রাপ্য সমস্ত সম্পদের সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক জমা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়া স্ত্রীর অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা তো রয়েছেই যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রেও স্বামীর প্রাপ্য সম্পদের কোন অংশ জমা রাখার সুযোগ নেই। সন্তান থাকার কারণে সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করা, পিতামাতা, ভাইবোনদের ভরণ পোষণ এবং দ্বিতীয় বিবাহ করতে হলে দ্বিতীয় স্ত্রীর মোহরানা ও ভরণ পোষণ বাবদ তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং স্ত্রীর দ্বিগুণ সম্পত্তি স্বামীকে দেয়া হলেও তাকে দেয়া হয়েছে প্রচুর দায়িত্ব। সে তুলনায় স্ত্রীকে তেমন কোন দায়িত্ব ইসলাম দেয়নি বরং পিতামাতা, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের থেকে কেবল সুবিধা লাভ করারই অধিকার প্রদান করেছে। সুতরাং উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে ঠকায়নি বরং স্বামীর তুলনায় স্ত্রীকে শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করেছে।

কন্যা সন্তানের অধিকার

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে কন্যা সন্তানের তিন অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থাঃ কন্যা যদি একজন হয় এবং পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার সকল সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ অর্থাৎ অর্ধেক পাবে।

যেমন– মরহুম গিয়াস উদ্দিন সাহেব মৃত্যুকালে এক কন্যা এবং পিতা রেখে যান। তাঁর পুত্র সন্তান নেই।

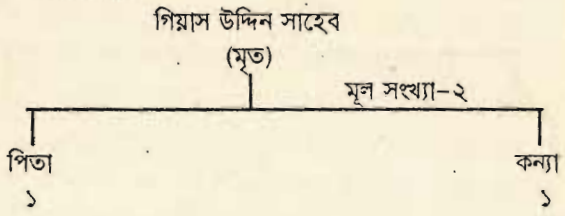

এমতাবস্থায়,

কন্যা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং

পিতা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ কন্যা যদি দুই বা ততোধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যারা পাবে পিতার সমস্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ। উক্ত অংশ সকল কন্যাদেরকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

যেমন– গিয়াস উদ্দিন সাহেব দুই কন্যা ও পিতা রেখে মারা গেলেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই।

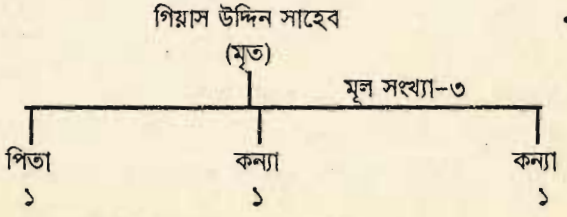

এমতাবস্থায়,

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং পিতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থাঃ কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তাহলে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে। যেমন মরহুম গিয়াস উদ্দিন সাহেব অথবা সাহিদা বেগম মৃত্যুকালে একপুত্র ও এক কন্যা রেখে যান।

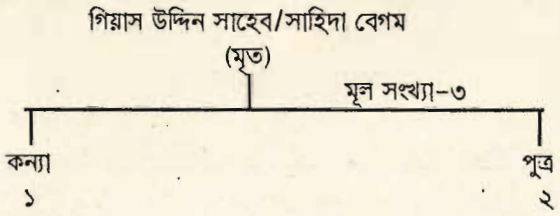

এমতাবস্থায়,

কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং পুত্র পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ।

* মৃত ব্যক্তির কন্যা ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে কন্যার উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ কন্যা মৃত পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব আত্মসাৎকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

আমাদের দেশে অনেক এলাকায় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তাঁর ক্ষমতাশালী আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করে বসে থাকে। কাউকে অংশ দেয়ার প্রয়োজনই মনে করে না। কেউ যদি তাঁর প্রাপ্য অংশ নিতে চায়, তাহলে সালিশী বিচার এবং মামলা মোকদ্দমা করা ব্যতীত নিতে পারে না। ওয়ারিশগণের অংশ না দেয়া কিংবা দেব দেব বলে টালবাহানা করা ইসলাম বিরোধী এবং মারাত্মক গুণাহের কাজ। কখনো কখনো দেখা যায়, পিতা নিজেই কন্যা সন্তানদের ঠকানোর উদ্দেশ্যে এবং কন্যারা স্বামীর বাড়ীতে অংশ নিয়ে যাবে এ ভয়ে জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের নামে দলিলপত্র করে দেয়। আবার কখনো দেখা যায়, মৃত্যুশয্যায় গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ডেকে এনে পুত্রদের নামে সম্পত্তি লিপিবদ্ধ করে দেন। এটা মারাত্মক অন্যায় এবং প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী। গ্রামের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণেরও এ ব্যাপারে ধর্মীয় তেমন কোন জ্ঞান না থাকায় তাঁরা এ কাজে কোন বাঁধা প্রদান করেন না। বিশ্বনবী (সাঃ) এ ব্যাপারে হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে কারোর নামে সম্পত্তি লিপিবদ্ধ করে যায়, তাহলে সে যেন নিজেই নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নিল।" এ সকল ইসলাম বিরোধী কাজ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, পুত্রের নামে সম্পত্তি লিপিবদ্ধ করে না দিলেও, পিতামাতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তি দখল করে রাখে। বোনদেরকে সম্পত্তি দিতে চায় না। যদি বোন পিতার কিংবা মাতার সম্পত্তির অংশ দাবী করে, তাহলে ভাইয়েরা বোনকে ভয় দেখিয়ে বলে, যদি সম্পত্তি নিয়ে যাও তাহলে ভাইবোনের সম্পর্ক আর থাকবে না। কোনদিন এ বাড়ীতে আর আসতে পারবে না। এছাড়া দুষ্ট, লোভী ও স্বার্থপর ভাইয়েরা অন্য মহিলাদের দিয়ে বোনকে বুঝাতে থাকে যে, ভাইয়ের নিকট থেকে কেন সম্পত্তি নিয়ে যাবে। আসবে যাবে, বেড়াবে, এটাই তো ভাল। তোদেরকে আদর করে বড় করেছে, বিয়ে দিয়েছে, সম্পত্তি নেয়ার জন্যে? কেন ভাইবোনের সম্পর্ক নষ্ট করবে। সম্পত্তি নিয়ে গেলে সম্পর্ক রাখবে কিভাবে? বাপের বাড়ীর চেহারা তো আর কোনদিন দেখতে পারবে না ইত্যাদি। এ ধরনের লোভী এবং স্বার্থপর ভাইদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বোনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করার কারণে পরকালে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ

ধরনের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ অনেক সময় বাহ্যিক দ্বীনদারগণের মধ্যেও দেখা যায়। অন্যদিকে বোন ভয়ে ভাইয়ের নিকট সম্পত্তি চায় না। বোন মনে মনে ভাবে, সম্পত্তি চাইলে ভাই হয়তো রাগ করবেন, এছাড়া সম্পত্তি চেয়ে যখন পাওয়াই যাবে না, তখন ভাইয়ের সাথে মন কষাকষি করে কি লাভ। বোন এসব কথা চিন্তা করে শত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও চক্ষু লজ্জায় মাফ করে দেয়। এতে ভাই কোন কোন সময় প্রসংগ ক্রমে বলেও থাকে যে, বোন তো মাফই করে দিয়েছে। এ ধরনের মাফ ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে মাফ হবে না। এভাবে বোনদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার বিচার আল্লাহর দরবারে একদিন অবশ্যই হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি আপনার বোনের নিকট হতে ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, কয়েকদিন পর তা মাফ করে দেবার জন্যে বলেন, তাহলে বোন কি আপনাকে মাফ করবে? নিশ্চয়ই না। কারণ বোন এ ৫০ হাজার টাকার মূল্য ও মর্ম অবশ্য বুঝেন। তদরূপ পিতার নিকট থেকে তার প্রাপ্য সম্পত্তির মূল্য যদি বোন বুঝত এবং এ সম্পত্তি বোনের ভোগ দখলে থাকত, তাহলে বোন কখনো মাফ করত না। সুতরাং ভাইয়ের হাতে সম্পত্তি রেখে বোনের নিকট থেকে মাফ নিলে, শরীয়তে এটা মাফ হবে না। তবে এক অবস্থায় মাফ হতে পারে। উহা এ যে, ভাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব করে বোনের অংশ কিংবা এর সমপরিমাণ টাকা বোনের হাতে হাসি মুখে দিয়ে দিবে এবং বলবে, বোন তুমি যদি এ সম্পদ নিয়ে যাও তাহলে আমি খুব খুশী হব এবং ভাইবোনের সম্পর্ক কোনদিন হ্রাস পাবে না। বোন এ সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ভাই নিজেও বোনকে বলতে পারবে না, অন্যকে দিয়েও বোনকে বলাতে পারবে না। বোন যদি এ সম্পদ নিজের অধীনে নিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর বোন স্বেচ্ছায় ভাইকে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়, তাহলে এটা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য যে, ভাইবোনের সম্পর্ক হচ্ছে রক্ত এবং রেহেমের সম্পর্ক। হাদিস শরীফে রয়েছে, বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" ভাইবোনের সম্পর্কের স্থায়ীত্ব পৈতৃক সম্পত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। যদি কোন ব্যক্তি সম্পত্তির লোভে বোনকে আদর যত্ন করে তাহলে সে কোন ছওয়াব পাবে না। বোনকে আদর যত্ন করতে হবে তার হক আদায়ের জন্যে এবং আলাহ ও তার রাসুলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং বোন সম্পত্তি নিয়ে গেলে ভাইবোনের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, এ ধরনের উক্তি কঠোর গুণাহের কাজ।

কোন কোন এলাকায় এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, ভাই বোনকে অংশ দিলেও সম্পূর্ণ অংশ দেয় না। যে অংশের মূল্য ৭০ হাজার টাকা, সেখানে মাত্র ১০/১৫ হাজার টাকা বোনকে দিয়ে সমস্ত অংশ ভাইয়ের নামে দলিলপত্র করে নেয়। বোন নিজেও তার সম্পূর্ণ অংশের ব্যাপারে অবগত নয় এবং ভাইও বোনকে সবকিছু বুঝাতে নারাজ। এছাড়া ভাইয়েরা বলে থাকে, বোন নাকি ভিটাবাড়ী থেকে অংশ পায় না। এগুলো হচ্ছে প্রতারণা এবং আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। বোন পিতার পরিত্যক্ত ভিটাবাড়ী, ফসলী জমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, কলকারখানা, স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হবে। কোন কোন এলাকার মা বোনেরা এ ধারণাও পোষণ করে থাকেন যে, বাপের বাড়ী থেকে অংশ আনা ভাল নয়, এতে অভাবে টানে, বিপদ আসে, রোগ হয় ইত্যাদি। এ ধরনের ধারণা করা ঠিক নয়। আল্লাহ পাক যেটাকে হালাল করে দিয়েছেন, সেটাকে হারাম মনে করাও অন্যায়। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আল্লাহ পাক যাদেরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন, তাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে গড়িমসি, টালবাহানা কিংবা কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না। অন্যের অধিকারকে খর্ব করার কারণে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির প্রভাবশালী ওয়ারিশগণ অসহায় ও গরীব ওয়ারিশগণকে বাদ দিয়েই নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। এতে গরীব ওয়ারিশগণের প্রতিবাদ করারও কোন ক্ষমতা থাকে না। এছাড়া এতীম এবং নাবালেগ ওয়ারিশগণ বালেগ হয়ে যাবে এবং উত্তরাধিকারী স্বত্ব দাবী করবে, এ ভয়েও অন্যান্য ওয়ারিশগণ তাড়াহুড়া করে নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। আবার কখনো এতীমদের সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির প্রভাবশালী আত্মীয় স্বজনগণ সরকারী রেকর্ডপত্রে নাম পরিবর্তন করে নিজ সন্তানদের নামও লিখিয়ে নেন। পবিত্র কোরআনে এরূপ অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের জন্যে ভীষণ শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

অর্থাৎ 'নিশ্চয়, যারা এতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে,তারা নিজেদের পেটে অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছুই ভর্তি করছে না এবং সত্বরই তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।' (সুরা- নিসা, আয়াত-১০)

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ٥

অর্থাৎ 'এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। উত্তম মালামালের সহিত খারাপ মালামালের বিনিময় করো না এবং তাদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে সংমিশ্রণ করে, তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা গুরুতর পাপ।'

(সুরা- নিসা, আয়াত-২)

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে-

وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ط

অর্থাৎ '(এতীমদের) সম্পত্তি অপব্যয়ে খরচ করো না এবং তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করো না।' (সুরা- নিসা)

হাদিস শরীফে রয়েছে, এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী কেয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার পেটের ভেতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা চক্ষু, মুখ ও নাক দিয়ে বের হতে থাকবে। রাসুলে করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে দু' ধরনের অসহায় ব্যক্তির মাল থেকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে হুশিয়ার করছি, একজন হচ্ছে নারী এবং অপরজন হচ্ছে এতীম।" অথচ বর্তমানে মুসলমানের দাবীদার হয়ে এক শ্রেণীর লোক এ দু' ধরনের অসাহয়ের সম্পত্তিই আত্মসাৎ করছে। এতীম সন্তান এবং নারীদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করা আল্লাহর গজব এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পুত্র কেন কন্যার দ্বিগুণ পায়ঃ মূল্যায়ন ও জবাব

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ইসলাম বিদ্বেষী তথাকথিত দাবীদারগণ বলে থাকেন, উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম নাকি কন্যা সন্তানদের অবহেলা করেছে এবং ঠকিয়েছে। কারণ একই পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও পুত্র সন্তান পাচ্ছে কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ সম্পত্তি। তাদের ভাষায় ইসলামের এ বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করার জন্যে তারা ইতিমধ্যে দাবীও জানিয়ে আসছেন।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কন্যা হিসেবে নারীদেরকে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করা হয়নি। বরং কন্যা সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই কন্যা হিসেবে নারী জাতিকে তাদের অপমাননা ও লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান বিশ্বে নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু নারীর অধিকার এবং মর্যাদা কেবলমাত্র পেপার পত্রিকা, বক্তব্য ও বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। মানব রচিত আইন নারী জাতিকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিতে পারেনি, তা দিয়েছে ইসলাম। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে করুণ অবস্থা তা আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। ঐ সকল ধর্মে নারীর অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা অবগত হবার পর এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম কন্যা সন্তানদের শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদার আসনেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি, উত্তরাধিকার আইনেও দেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ অধিকার।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রসংগে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনে যাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন হল পুরুষ, আর বাকি ৮ জনই হল নারী। পবিত্র কোরআনে কন্যার অংশকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যা কন্যারা পাবেই। পক্ষান্তরে একই পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করার পরও পবিত্র কোরআনে পুত্রের অংশ নির্দিষ্ট করে তাদেরকে যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পুত্রদেরকে রাখা হয়েছে আসাবা হিসেবে। উপরন্ত পুত্রের অংশ পাবার ব্যাপারে কন্যার অংশকে আসল ভিত্তি বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে কী প্রমাণীত হয় না যে, ইসলাম পুত্রের তুলনায় কন্যার অধিকারকেই প্রাধান্য দিয়েছে?

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন হচ্ছে একটি বৈষম্যহীন ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা। পুত্রের দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবার ব্যাপারে অবশ্য যুক্তি রয়েছে। কন্যা সন্তান যদিও পুত্রের অর্ধেক পায়, তথাপি সবকিছু মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যায়, কন্যার সম্পত্তির পরিমাণ পুত্রের চেয়ে কম নয়।

মনে করুন মরহুম জাব্বার সাহেব মৃত্যুকালে এক পুত্র ও দুই কন্যা যথাক্রমে আরিফ, ফাতেমা, রোকেয়া এবং স্ত্রী মাসুদা বেগমকে রেখে যান।

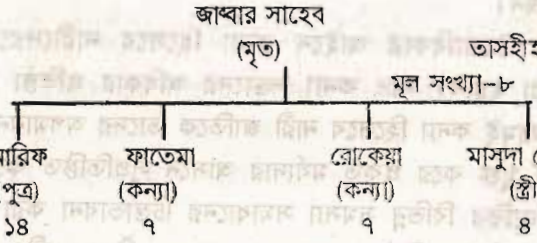

এমতাবস্থায়,

মরহুম জাব্বার সাহেবের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হতে

স্ত্রী মাসুদা বেগম পাবে $\frac{৪}{৩২}$ অংশ,

কন্যা ফাতেমা পাবে $\frac{৭}{৩২}$ অংশ,

কন্যা রোকেয়া পাবে $\frac{৭}{৩২}$ অংশ এবং

পুত্র আরিফ পাবে $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল দায়িত্ব আসে পুত্রের উপর। উপরোক্ত উদাহরণে যদি ধরে নেয়া হয় যে, পিতার মৃত্যুর সময় দুই কন্যা হল নাবালিকা এবং অবিবাহিতা এবং পুত্র আরিফ হল বড় এবং বিবাহিত, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের সকল দায়িত্ব আসে পুত্র আরিফের উপর। আরিফের দায়িত্ব হল, তার দুই ছোট বোনের লালন পালন, পোশাক পরিচ্ছদ ও খানা খাদ্যের ব্যবস্থা করা, লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করা এবং সৎপাত্রে বিবাহ দেয়া। এর জন্যে আরিফের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ খরচ হবে আরিফের সম্পদ থেকে। বোনদেরকে বিবাহ দেয়ার পর বোনের স্বামীপক্ষের যত আত্মীয় স্বজন থাকবে,

তারা যখনই বেড়াতে আসবে, তাদের মেহমানদারী করার দায়িত্বও হচ্ছে ভাই আরিফের। এছাড়া মা মাসুদা বেগমের সেবাযত্ন সহ তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্বও হচ্ছে আরিফের। মায়ের সেবাযত্ন করা সন্তানের উপর ফরজ। যেহেতু আরিফ বিবাহিত, এক্ষেত্রে তার স্ত্রী এবং নিজ সন্তানদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থাও তাকেই করতে হবে। এছাড়া আরিফের শ্বশুর বাড়ী ও অন্যান্য জায়গা থেকে আত্মীয় স্বজন বেড়াতে আসলে সে খরচও তাকেই বহন করতে হবে। উপরন্ত সামাজিক অন্যান্য খরচ তো আছেই। সুতরাং আরিফ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তি হতে যে $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ পেয়েছে তার তুলনায় আরিফের দায়িত্ব ও খরচের পরিমাণ খুব বেশী। $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ সম্পত্তির কিয়দাংশ জমা রাখা তো দূরের কথা, রাতদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পুত্র আরিফকে সংসারের খরচাদি উপার্জন করতে হবে।

অপরদিকে মরহুম জাব্বার সাহেবের দুই কন্যা অর্থাৎ আরিফের দুই বোন ফাতেমা ও রোকেয়া পিতার মৃত্যুর পর বিহাহের পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া, লেখাপড়া ও চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচ পেয়েছে ভাই আরিফ থেকে। তারা প্রত্যেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তির যে $\frac{৭}{৩২}$ অংশ পেয়েছিল তার কোন অংশই খরচ করার প্রয়োজন তাদের হয়নি। সম্পূর্ণই জমা রয়েছে। বিবাহের সময় তারা স্বামীর নিকট থেকে মোহরানার অর্থও পাে।ব স্ত্রীর মোহরানার অর্থ পরিশোধ করতে স্বামী ইসলামী আইনে বাধ্য। এছাড়া বিবাহের পর তারা স্বীয় স্বামীর নিকট থেকে খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ এবং চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচ পাবে। বিবাহের পর স্বামীপক্ষের কিংবা বাপের বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের জন্যে ভরণ পোষণ বাবদ অর্থ সম্পদ ব্যয় করতেও তারা অর্থাৎ ফাতিমা ও রোকেয়া ইসলামী আইনে বাধ্য নয়। সুতরাং একদিকে ভাই আরিফ $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ সম্পত্তির কোন অংশই জমা রাখতে পারছে না, অন্যদিকে বোন ফাতিমা ও রোকেয়া প্রত্যেকেরই $\frac{৭}{৩২}$ অংশ সম্পত্তি এবং মোহরানার অর্থ জমা থাকছে এবং থাকবে। উপরন্ত তারা প্রত্যেকেই স্বামী, মা, ভাই ও বোন থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাবে। মানুষের প্রয়োজনের জন্যেই সম্পদ, সম্পদের জন্যে প্রয়োজন নয়। পুত্র কন্যার অংশ সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা তো এটাই

প্রমাণীত হয় যে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কন্যা হিসেবে নারীর অধিকারকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত উদাহরণে যদি এরূপ ধরে নেয়া হয় যে, মরহুম জাব্বার সাহেবের মৃত্যুকালে পুত্র আরিফ ছিল নাবালক এবং কন্যা ফাতিমা ও রোকেয়া ছিল বড় এবং জাব্বার সাহেব নিজেই তাদেরকে সৎপাত্রে বিবাহ দিয়ে গেছেন, তাহলেও পুত্র আরিফের দুঃখের শেষ নেই। যেহেতু ইসলামী আইনে কন্যা ফাতিমা ও রোকেয়া তাদের ভাই আরিফ ও মা মাসুদা বেগমের ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য খরচ দিতে বাধ্য নয়, সেহেতু তাদের প্রাপ্য $\frac{৭}{৩২}$ অংশ এবং মোহরানার টাকা খরচ হবার কোন প্রশ্নই আসে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তারা সমস্ত খরচ পাচ্ছে স্বামীর নিকট হতে। এমতাবস্থায় তাদের ভাই আরিফ পিতার সম্পত্তি থেকে যে $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ পেয়েছে তা দিয়েই তাকে লেখাপড়া শিখে বড় হতে হবে। নিজের এবং তার মা মাসুদা বেগমের ভরণ পোষণ ও চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচ $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ হতেই ব্যয় করতে হবে। এছাড়া বোনেরা অর্থাৎ ফাতিমা ও রোকেয়া যখন স্বামীর বাড়ীর আত্মীয় স্বজন নিয়ে বেড়াতে আসবে তখন সে ব্যয়ভারও ভাই আরিফকেই বহন করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, আরিফ যখন বড় হবে এবং বিবাহ করার প্রয়োজন হবে, তখন স্ত্রীর মোহরানার অর্থ এবং বিবাহের অন্যান্য খরচাদি তাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তার এসকল খরচাদি দেবার জন্যে মা কিংবা বোনেরা বাধ্য নয়। সুতরাং তাকে তার উক্ত $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ সম্পত্তি ব্যতীত আর কী আছে? তার বিভিন্ন খরচ ও প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করলে পৈতৃক $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ সম্পত্তি দিয়ে কী হবে? এ সম্পত্তি টুকু তো বিবাহের পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিবাহোত্তর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জীবন কাটাতে কী তার কষ্ট হবে না? বোনদের তুলনায় অবশ্যই হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলাম পুত্র সন্তানদেরকে কন্যা সন্তানদের দ্বিগুণ সম্পত্তির অধিকারী করলেও তাকে দেয়া হয়েছে প্রচুর দায়িত্ব। তার প্রাপ্য অংশ প্রয়োজন ও খরচের তুলনায় খুবই সামান্য। কন্যা সন্তান পুত্রের অর্ধেক পেলেও, তার প্রায় সবটুকুই আয় থাকে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সে আরো সম্পদের মালিক হয়ে থাকে। কিন্তু পুত্র সন্তানের জমা করার কোন ব্যবস্থা নেই। এমনিভাবে মূল্যায়ন

করলে দেখা যাবে উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম কন্যা হিসেবে নারীদের ঠকায়নি বরং পুরুষের তুলনায় লাভবান করেছে। উপরোক্ত আলোচনা মোতাবেক পুত্র সন্তান এত দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা এবং আর্থিক কষ্ট সহ্য করার পরও আল্লাহ্ পাকের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থার বিরোধীতা করেনি এবং বোনদের এতসব সঞ্চয় দেখেও হিংসা কিংবা উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে পুত্র সন্তানদেরকে পিতা এবং মাতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী বানাবার দাবী করেনি। কারণ এটা প্রকাশ্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরোধীতা করার সামিল। পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণ আল্লাহ্ পাকের আইনের সমালোচনা করছে এবং এ আইনকে সংশোধন করার দাবী জানাচ্ছে। এটা প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী এবং অধিকার আদায়ের নামে নারী জাতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। পুত্রের দ্বিগুণ পাওয়া অযৌক্তিক নয় এবং এতে কন্যার প্রতি বেইনসাফও করা হয়নি।

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ

পৌত্রীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। পৌত্রীর অধিকার এর ৬ষ্ঠ অবস্থায় (যা পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) বলা হয়েছে যে, পুত্রের বর্তমানে পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থাৎ মৃত পুত্রের সন্তান সন্ততিগণ ওয়ারিশ হবে না। ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে মৃত পুত্রের বর্তমানে পুত্রের সন্তান সন্ততিদেরকে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে যদি তার পুত্র স্বীয় সন্তানদের রেখে মারা যায় এবং ঐ ব্যক্তির অন্য কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থাৎ মৃত পুত্রের সন্তানগণ ওয়ারিশ হবে না।

উদাহরণ স্বরূপঃ জনাব ছাত্তার সাহেবের স্ত্রী ফরিদা বেগম এবং দুই পুত্র কাশেম ও মালেক আছে। গত ৫-১-৯০ ইং তারিখে পুত্র মালেক তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে যথাক্রমে রহিম এবং নাসিমাকে রেখে মারা যায়। এরপর গত ৬-১২-৯৩ ইং তারিখে জনাব ছাত্তার সাহেবও মারা যান। এমতাবস্থায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে রহিম এবং নাসিমা মরহুম ছাত্তার সাহেবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না।

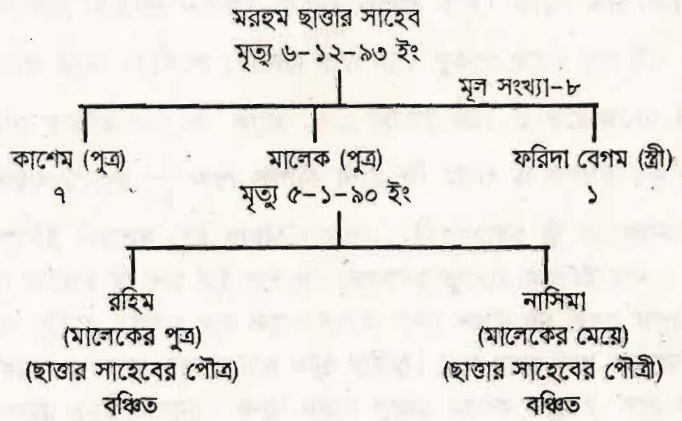

এমতাবস্থায়,

মরহুম ছাত্তার সাহেবের স্ত্রী ফরিদা বেগম পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং

মরহুম ছাত্তার সাহেবের পুত্র কাশেম পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ

পৌত্রী নাসিমা এবং পৌত্র রহিম কোন অংশ পাবে না।

পুত্রের তুলনায় পৌত্রী নাসিমা এবং পৌত্র রহিম দূরবর্তী আত্মীয় হবার কারণে যদিও তাদেরকে কোন অংশ দেয়া হয়নি, কিন্তু ইসলামে অন্যভাবে তাদের সম্পদ পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সামনে আলোচনা করা হবে। ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ পাক অংশ প্রাপ্যদের ঈমানকে পরীক্ষা করবেন।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌত্রী এবং পৌত্রগণকে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পৌত্রী এবং পৌত্রগণ তাদের মৃত পিতার স্থলাভিসিক্ত হবে, অর্থাৎ তাদের মৃত পিতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত, পিতার অবর্তমানে তারা সে অংশের অধিকারী হবে। কিন্তু ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না। এ সংশোধনী আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের তৈরী আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশ গত ১৫-৭-৬১ ইং তারিখ হতে বাংলাদেশে বলবৎ আছে। উক্ত আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে,

"যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে, তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তার কোন পুত্র বা কন্যা স্বীয় সন্তানদের জীবিত রেখে মারা যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনকালে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ জীবিত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে। অর্থাৎ মৃত পিতা বা মাতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত তারা সে অংশ পাবে।"

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলঃ

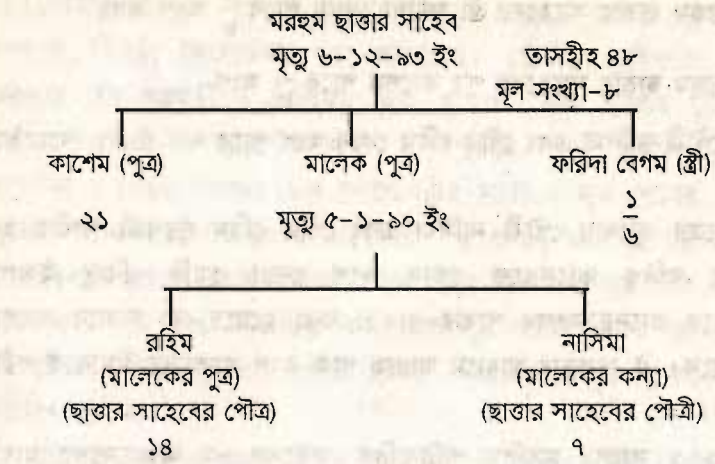

এমতাবস্থায়, ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের বলে-

স্ত্রী ফরিদা বেগম পাবে $\frac{৬}{৪৮}$ অংশ

পুত্র কাশেম পাবে $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ

পৌত্রী নাসিমা পাবে $\frac{৭}{৪৮}$ অংশ

পৌত্র রহিম পাবে $\frac{১৪}{৪৮}$ অংশ।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ নং ধারা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু ইসলামী উত্তরাধিকার আইন প্রতিনিধিত্বের নীতিকে (Principle of representation) সমর্থন করে না।

পৌত্রীর অধিকার

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পৌত্রীদের (পুত্রের কন্যাদের) উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভের ৬টি অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থাঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার ঔরষজাত কোন কন্যা সন্তান যদি না থাকে এবং পৌত্রী যদি মাত্র একজন হয়, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সকল সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। যেমন– করিম সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী, পৌত্রী এবং ভাই রেখে মারা গেলেন।

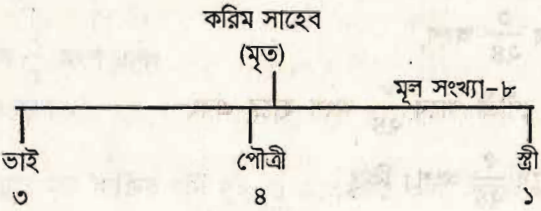

এমতাবস্থায়, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ

পৌত্রী পাবে $\frac{৪}{৮}$ অংশ এবং

ভাই পাবে $\frac{৩}{৮}$ অংশ।

কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ নং অধ্যাদেশের বলে বর্তমানে–

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ

পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ এবং

ভাই বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির ঔরষজাত কন্যাদের অবর্তমানে পৌত্রী যদি দুই বা ততোধিক থাকে, তাহলে তারা পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং উক্ত অংশ পৌত্রীগণ নিজেদের মধ্যে সমান সমানভাবে ভাগ করে নিবে।

যেমন– আসাদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পৌত্রী এবং চাচা রেখে যান।

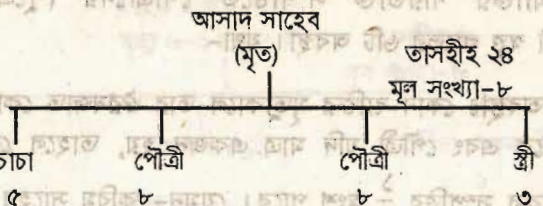

এমতাবস্থায়, ইসলামী আইনে

স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{২৪}$ অংশ,

প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $\frac{৮}{২৪}$ অংশ হারে এবং

চাচা পাবে $\frac{৫}{২৪}$ অংশ। কিন্তু

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের বলে এক্ষেত্রে বর্তমানে,

স্ত্রী পাবে $\frac{২}{১৬}$ অংশ,

প্রত্যেক পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{১৬}$ অংশ হারে এবং

চাচা বঞ্চিত হবে।

তৃতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির ঔরষজাত একজন কন্যা যদি থাকে, তাহলে পৌত্রীগণ পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ। যেমন– যায়েদ সাহেব এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং চাচা রেখে মারা গেলেন।

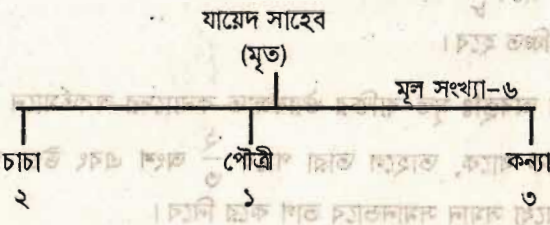

এমতাবস্থায়, ইসলামী আইনে,

কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ

পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং

চাচা পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ।

কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর বলে এক্ষেত্রে বর্তমানে–

কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ,

পৌত্রী পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং

চাচা বঞ্চিত হবে।

চতুর্থ অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে পৌত্রী কোন অংশ পাবে না। দুই কন্যা বর্তমান থাকায় তারাই সর্বোচ্চ অংশ $\frac{২}{৩}$ ভাগ পাবে। মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে কন্যারা অধিক নিকটবর্তী। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হয়।

যেমন– ফরিদ সাহেব দুই কন্যা, পৌত্রী ও ভাই রেখে মারা গেলেন।

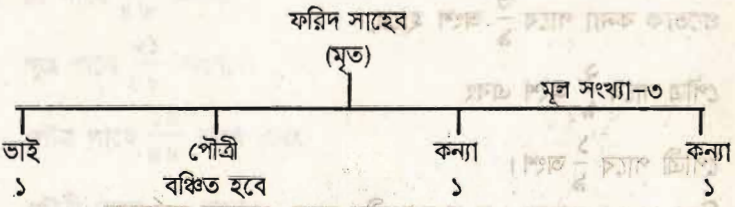

এমতাবস্থায়, ইসলামী আইনে

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ হারে,

ভাই পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং

পৌত্রী বঞ্চিত হবে।

কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ হারে,

পৌত্রী পাবে $\frac{২}{৪}$ অংশ এবং

ভাই বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক কন্যা বর্তমান থাকাবস্থায় যদি পৌত্রীদের সহিত তাদের সহোদর ভাই, চাচাত ভাই অথবা তাদের নিম্ন শ্রেণীর এক বা একাধিক পুরুষ সন্তান অর্থাৎ পৌত্রীদের ভাইপো, ভাইপো পুত্র ইত্যাদি থাকে, তাহলে পৌত্রীরা আসাবা হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির কন্যাদ্বয়ের অংশ দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পৌত্রীদের মধ্যে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হারে বন্টন করা হবে। যেমন– কামাল সাহেব দুই কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রী রেখে মারা গেলেন।

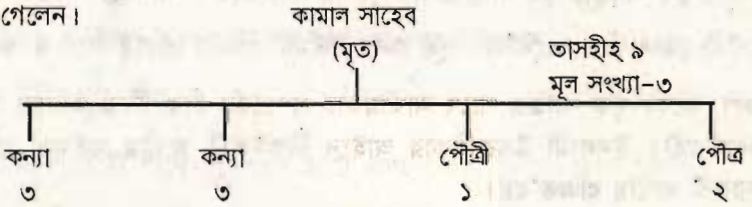

এমতাবস্থায়, ইসলামী আইনে

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩}{৯}$ অংশ হারে,

পৌত্র পাবে $\frac{২}{৯}$ অংশ এবং

পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৯}$ অংশ।

কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩}{১২}$ অংশ হারে,

পৌত্র পাবে $\frac{৪}{১২}$ অংশ এবং

পৌত্রী পাবে $\frac{২}{১২}$ অংশ।

ষষ্ঠ অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির যদি কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে তাহলে পৌত্রী কোন অংশ পাবে না। এ অবস্থায় পৌত্রীর সাথে পৌত্র থাকলেও অংশ পাবে না।

যেমন– সাত্তার সাহেব স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র এবং পৌত্রী রেখে মারা গেলেন।

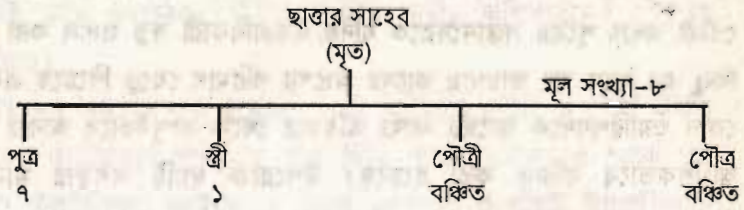

এমতাবস্থায়, ইসলামী আইনে

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং

পুত্র পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ।

পৌত্র এবং পৌত্রী বঞ্চিত হবে।

কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে

স্ত্রী পাবে $\frac{৬}{৪৮}$ অংশ,

পুত্র পাবে $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ,

পৌত্র পাবে $\frac{১৪}{৪৮}$ অংশ এবং

পৌত্রী পাবে $\frac{৭}{৪৮}$ অংশ।

* মৃত ব্যক্তির যদি পৌত্রী ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকে, তাহলে ইসলামী আইনে পৌত্রীর উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে পৌত্রী।

বিঃ দ্রঃ ইসলামের উপরোক্ত আইন, বিশেষ করে পৌত্রীদের ৬ষ্ঠ অবস্থার প্রেক্ষাপটেই ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এর ৮ম অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছিল। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে বাতিল করে পৌত্র এবং পৌত্রীদেরকে মৃত ব্যক্তির পুত্রের বর্তমানে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব প্রদান করা হয়। আল্লাহর তৈরী আইনকে উপেক্ষা করে ৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌত্র, পৌত্রী অর্থাৎ পুত্রের সন্তানদেরকে যদিও উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এর ফলে বহু জায়গায় তাদের অংশের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এবং কোন কোন ওয়ারিশগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে আবার কাউকে আংশিকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। উপরোক্ত ছয়টি অবস্থার মাত্র ছয়টি উদাহরণের মধ্যেই এর সত্যতা ফুটে উঠেছে।

পুত্রের বর্তমানে পৌত্র পৌত্রীর বঞ্চিত হবার কারণ

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে পৌত্রীর অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম পৌত্রীগণের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু পৌত্রদের অংশ নির্দিষ্ট নেই। পৌত্রের অংশ পাবার ব্যাপারে পৌত্রীগণের অংশকেই মূলভিত্তি বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে অর্থাৎ পৌত্রের অংশ পৌত্রীর দ্বিগুণ হবে। সুতরাং পৌত্রীর অংশ নির্দিষ্ট করে এখানেও পৌত্রীর মাধ্যমে নারীর অধিকারকেই ইসলাম প্রাধান্য দিয়েছে।

পৌত্রীর ৬ষ্ঠ অবস্থায় বলা হয়েছে, পুত্রের বর্তমানে পৌত্রী ও পৌত্র বঞ্চিত হবে। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে পুত্রের সন্তানদের থেকে পুত্র নিকটবর্তী। উত্তরাধিকার আইনে যে কোন সম্পর্কের আত্মীয়ই উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার সঠিক মাপকাঠি নয়। নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। নিকটতম আত্মীয় হওয়াকে যদি সঠিক মাপকাঠি করা না হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর দুনিয়ার সবাই মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবার জন্যে দাবী করবে। কারণ সবাই এক আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি। কাজেই দুনিয়ার সবাই পরস্পরের সাথে কমবেশী আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ নেয়ার জন্যে সবার মধ্যে কাটাকাটি, মারামারি, ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে এবং পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করা আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, সেহেতু আত্মীয়তার ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করে দেয়াও জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে চিহ্নিত করে দূরবর্তী আত্মীয়দের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। পুত্রের সন্তানগণ যেহেতু পুত্রের তুলনায় দূরবর্তী আত্মীয়, সেহেতু পুত্র জীবিত থাকা অবস্থায় পুত্রের সন্তানগণ ওয়ারিশ হবে না।

এতীম পৌত্র পৌত্রীদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা

পুত্রের সন্তানগণ যদি এতীম হয় এবং পুত্রদের তুলনায় অভাবগ্রস্থও হয় তথাপি ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে তারা ওয়ারিশ হবে না। কারণ অভাব উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবার শর্ত নয়। তবে অভাব গ্রস্থদের যদিও কোন অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, কিন্তু তাদের অভাব দূর করার জন্যে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে সুরায়ে নিসার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ

فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥

অর্থাৎ 'সম্পদ বন্টনকালে যদি তোমাদের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনগণ, এতীমগণ এবং মিসকিনগণ উপস্থিত থাকে তাহলে তাদেরকে উহা হতে কিছু প্রদান কর এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল।'

দূরবর্তী আত্মীয়, এতীম ও অভাবগ্রস্থদের যদিও ইসলামী আইনে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক বিবেচনা করে নির্দিষ্ট কোন অংশ দেয়া হয়নি, কিন্তু তাদের মনকষ্ট ও নৈরাশ্যকে উপেক্ষাও করা হয়নি। উপরোক্ত আয়াতে তাদেরই অভাব দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অংশ বন্টন করার সময় দূরবর্তীয় আত্মীয় স্বজন, গরীব, মিশকিন, এতীম যেমন– উপরের পৌত্র পৌত্রীগণ কিছু পাবার আশায় হয়তো বসে থাকতে পারে, কিন্তু আইনে তারা পায় না। ফলে মনে অনেক দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা নিয়ে ফিরে যাবে। এমতাবস্থায় অংশীদারগণের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়া। প্রত্যেকেই যদি আল্লাহ পাকের উপরোক্ত উপদেশের ভিত্তিতে কিছু কিছু করে দিয়ে দেয় তাহলে তাদের অভাব অনায়াসে লাঘব হবে। এটা হবে অংশীদারগণের জন্যে ছওয়াবের কাজ। এ উপদেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পরীক্ষা করবেন, কারা আল্লাহ তা'য়ালার এ ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের মাধ্যমে অংশ পাবার পর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে এতীমদেরকে কিছু অংশ দিয়ে দিল, আর কারা দিল না এবং অকৃতজ্ঞ হল।

দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন ও এতীমদেরকে দান হিসেবে কিছু দেবার পরও যদি তারা সন্তুষ্ট না হয়, বরং আরো চায় তাহলে তাদের এ চাওয়া আইন সম্মত নয়। কিন্তু তাই বলে তাদেরকে ধমক দেয়া, খারাপ ব্যবহার করা, তিরস্কার করা কখনো ঠিক নয়। তাদেরকে আদর দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই আয়াতের শেষ অংশে বলে দেয়া হয়েছে–

وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ه

অর্থাৎ 'তোমরা তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল।' তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিও না এবং এমন কোন কথা বল না যার দ্বারা তারা মনে কষ্ট পেতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ পাক যে ইনসাফ ভিত্তিক আইন তৈরী করে দিয়েছেন তার সমালোচনা, বিরুদ্ধাচরণ করা এবং এর উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার মানুষের নেই। প্রত্যেক মুসলমান যদি আল্লাহ্ পাকের উপরোক্ত উপদেশটি যথাযথভাবে পালন করেন তাহলে নিঃসন্দেহে এতীম পৌত্র পৌত্রীদের সমস্যার সমাধানটি বেরিয়ে আসবে। এখানে আমাদের আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আইনের জন্যে মানুষ নয় বরং মানুষের জন্যেই আইন। কিন্তু আইন হচ্ছে একটি সীমারেখা মাত্র। সুতরাং শুধুমাত্র আইন তৈরীর মাধ্যমেই সবকিছুর সমাধান এবং আল্লাহ্ পাকের পূর্ণ নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। বরং এর জন্যে প্রয়োজন উদারতা, সততা, ন্যায় পরায়ণতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানবতা। উপরোক্ত আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন মানবজাতিকে এ বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন এবং এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে পৌত্র–পৌত্রীদের অংশ পাওয়ার বিষয়টি।

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের কুফল

আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে মানব রচিত আইন দিয়ে কখনো সমস্যার সঠিক সমাধান হয় না। বরং আরো নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এর ৮ম অধ্যাদেশের মাধ্যমে মৃত পুত্র ও কন্যার সন্তানদেরকে উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব প্রদান করায় অন্যের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীকে ইসলাম সমর্থন করে না। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে একের উপকার করতে গিয়ে বহু ওয়ারিশগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে কাউকে আংশিক, আবার কাউকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলঃ

১। পৌত্রীর অধিকার এর প্রথম অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে পৌত্রী পায় $\frac{৪}{৮}$ অংশ এবং ভাই পায় $\frac{৩}{৮}$ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের ফলে পৌত্রীর অংশ বেড়ে $\frac{৭}{৮}$ অংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে ভাইকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।

২। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী আইনে প্রত্যেক পৌত্রী পায় $\frac{৮}{২৪}$ অংশ হারে এবং চাচা পায় $\frac{৫}{২৪}$ অংশ। কিন্তু ৮ম অধ্যাদেশের ফলে পৌত্রী পাচ্ছে $\frac{৭}{১৬}$ অংশ, অপরদিকে চাচাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া কখনো ইসলাম সম্মত নয়।

৩। তৃতীয় অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী আইনে কন্যা পাচ্ছে $\frac{৩}{৬}$ অংশ, পৌত্রী $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং চাচা পাচ্ছে $\frac{২}{৬}$ অংশ। ৮ম অধ্যাদেশের ফলে এক্ষেত্রে পৌত্রীর অংশ বেড়ে হচ্ছে $\frac{২}{৩}$ অংশ। অপরদিকে কন্যার অংশ কমে $\frac{১}{৩}$ অংশে দাঁড়িয়েছে এবং চাচাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর কারণে কন্যার অংশকে ইসলাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং চাচাকেও উত্তরাধিকারী করেছে। কিন্তু মানব রচিত অধ্যাদেশ কন্যার অংশকে কমিয়ে দিয়েছে, চাচাকেও বঞ্চিত করেছে। এর জন্যে কাকে দায়ী করা হবে? ইসলামী আইনকে নাকি মানব রচিত অধ্যাদেশকে?

৪। চতুর্থ অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী আইনে প্রত্যেক কন্যা পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং ভাই পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ। কিন্তু অধ্যাদেশের কারণে পৌত্রী পেয়েছে $\frac{২}{৪}$ অংশ। পক্ষান্তরে কন্যার অংশ হ্রাস পেয়ে প্রত্যেক কন্যা পেয়েছে $\frac{১}{৪}$ অংশ করে এবং ভাইকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর কারণে ইসলাম কন্যা এবং ভাইকে যে অধিকার দিয়েছে, সে অধিকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে খর্ব করা হয়েছে।

৫। এমনিভাবে পঞ্চম অবস্থায়ও প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী আইনে প্রত্যেক কন্যা পাচ্ছে $\frac{৩}{৯}$ অংশ, পৌত্র $\frac{২}{৯}$ অংশ এবং পৌত্রী $\frac{১}{৯}$ অংশ। এক্ষেত্রে অধ্যাদেশের কারণে প্রত্যেক কন্যা মোট সম্পত্তির $\frac{৩}{৯}$ অংশের স্থলে পাচ্ছে $\frac{৩}{১২}$ অংশ। কন্যা হিসেবে নারীর এ অধিকার খর্বের জন্যে কী অধ্যাদেশ দায়ী নয়?

৬। ৬ষ্ঠ অবস্থায়ও প্রদত্ত উদাহরণে পুত্রের অধিকারকে চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে অর্থাৎ ইসলামী আইনে পুত্র পেয়েছিল $\frac{৭}{৮}$ অংশ, কিন্তু অধ্যাদেশের কারণে পুত্রের অংশ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে পেয়েছে মাত্র $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ।

এমনিভাবে আরো অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যাবে, যেখানে উল্লেখিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে অন্যের ন্যায্য অধিকারকে কেড়ে নেয়া হয়েছে।

সহোদর বোনের অধিকার

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সহোদর বোন ৫ (পাঁচ) অবস্থায় অংশ পেয়ে থাকে। যথা–

প্রথম অবস্থাঃ সহোদর বোন একজন হলে $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

যেমন– সালাম সাহেব ১ বোন ও চাচা রেখে মারা গেলেন।

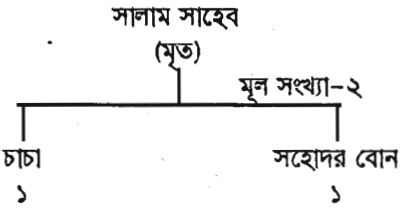

এমতাবস্থায়,

বোন পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং

চাচা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ সহোদর বোন দুই বা ততোধিক হলে, তারা সবাই মিলে পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং উক্ত অংশ প্রত্যেকে সমান সমানভাবে ভাগ করে নিবে।

যেমন– করিম দুই বোন ও চাচা রেখে মারা গেল।

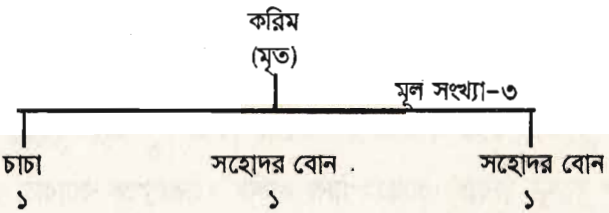

এমতাবস্থায়,

প্রত্যেক সহোদর বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ করে এবং চাচা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থাঃ বোনের সাথে ভাই থাকেল বোন আসাবা হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বোনের দ্বিগুণ পাবে ভাই।

যেমন– যায়েদ ১ ভাই ও ১ বোন রেখে মারা গেল।

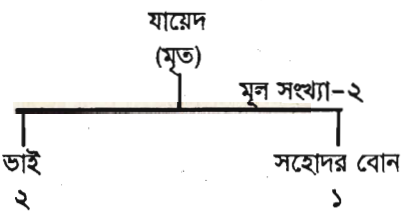

এমতাবস্থায়,

বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং

ভাই পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ।

চতুর্থ অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রীগণ বর্তমান থাকলে বোন আসাবা হবে। অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বোন পাবে। বিশ্বনবী (সাঃ) ফরমায়েছেন, "বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা করে দাও।" যেমন– রহিম ১ কন্যা, ১ পৌত্রী এবং ২ বোন রেখে মারা গেল।

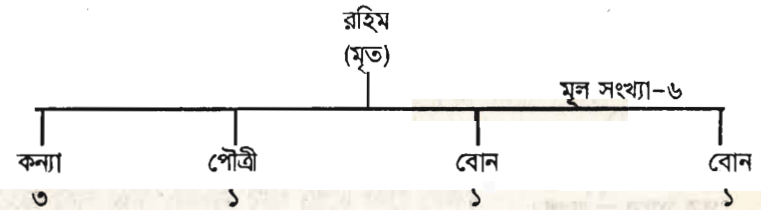

এমতাবস্থায়,

কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ,

পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং

প্রত্যেক বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে।

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে

কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ,

পৌত্রী পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ

এবং বোন বঞ্চিত হবে।

অধ্যাদেশের ফলে কন্যার অংশ হ্রাস পেয়ে পৌত্রীর অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বোন বঞ্চিত হয়েছে।

পঞ্চম অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র বা তনিম্নের কেউ অথবা পিতা জীবিত থাকলে ইসলামী আইনবিদগণের সর্বসম্মতভাবে বোন ওয়ারিশ হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে দাদার বর্তমানেও বোন ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে দাদার বর্তমানে বোনগণ ওয়ারিশ হবে। এ স্থলে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ পেশ করা হল। যেমন– সাদেক সাহেব স্ত্রী, পুত্র এবং বোন রেখে মারা গেলেন।

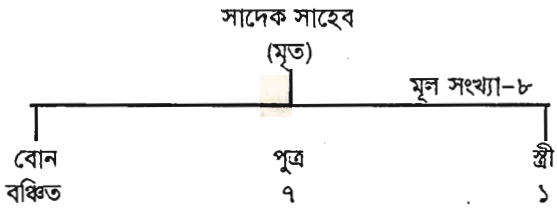

অমতাবস্থায়,

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং

পুত্র পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ।

বোন বঞ্চিত হবে। (ইসলামী আইনবিদগণের সর্বসম্মতভাবে)।

* মৃত ব্যক্তির সহোদর বোন ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিশ যদি না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি সহোদর বোনদের প্রতি রদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে সহোদর বোনগণ।

বৈমাত্রেয়া বোনের অধিকার

মা দুইজন কিন্তু পিতা একজন হলে অর্থাৎ পিতার অন্য স্ত্রীর গর্ভের কন্যা সন্তানকে বৈমাত্রেয়া বোন বলা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবার ব্যাপারে বৈমাত্রেয়া বোনের ৭ অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থাঃ বৈমাত্রেয়া বোন মাত্র একজন হলে পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।

যেমন– রহিম এক বৈমাত্রেয়া বোন এবং চাচা রেখে মারা গেল।

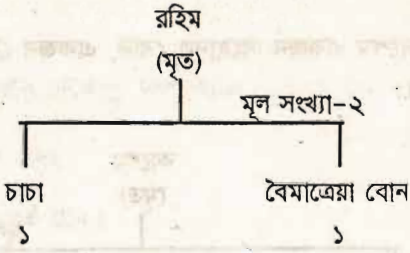

এমতাবস্থায়,

বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং

চাচা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ বৈমাত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে এবং মৃত ব্যক্তির কোন সহোদর বোন না থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ সবাই মিলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে এবং প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ সমান সমান হবে। যেমন– হালিম দুইজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং একজন চাচা রেখে মারা গেল।

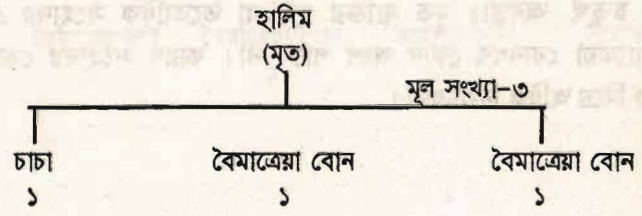

এমতাবস্থায়,

প্রত্যেক বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ হারে এবং

চাচা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির একজন সহোদর বোন থাকলে এবং সেই সাথে বৈমাত্রেয়া বোন এক বা ততোধিক থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ।

যেমন– কাশেম একজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং চাচা রেখে মারা গেল।

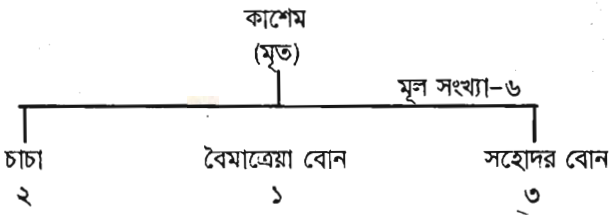

এমতাবস্থায়,

সহোদর বোন পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ,

বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং

চাচা পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ।

চতুর্থ অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ সহোদর বোন আত্মীয়তার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী।

যেমন– লাল মিয়া দুইজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং চাচা রেখে মারা গেল।

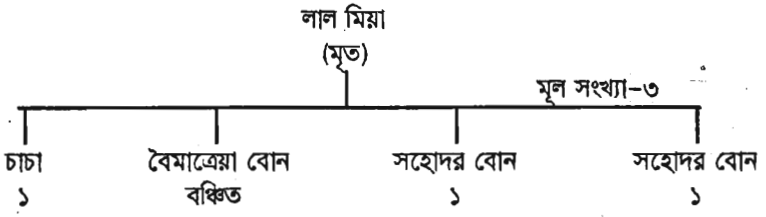

এমতাবস্থায়,

প্রত্যেক সহোদর বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ হারে,

চাচা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং

বৈমাত্রেয়া বোন বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম অবস্থাঃ দুই বা ততোধিক সহোদর বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোনের সংগে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তাহলে সে বোনদেরকে আসাবা করে দিবে। অর্থাৎ সহোদর বোনগণ তাদের $\frac{২}{৩}$ অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈমাত্রেয়া ভাইবোনগণ পাবে এবং বোনের দ্বিগুণ হিসেবে ভাই পাবে।

যেমন– কালু মিয়া দুইজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং একজন বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল।

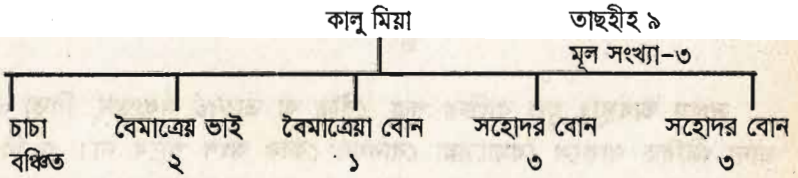

এমতাবস্থায়,

প্রত্যেক সহোদর বোন পাবে $\frac{৩}{৯}$ অংশ হারে,

বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৯}$ অংশ,

বৈমাত্রেয় ভাই পাবে $\frac{২}{৯}$ অংশ এবং

চাচা বঞ্চিত হবে।

ষষ্ঠ অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ আসাবা হবে। অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণ তাদের অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে।

যেমন– বাসেদ সাহেব এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং দুইজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেলেন।

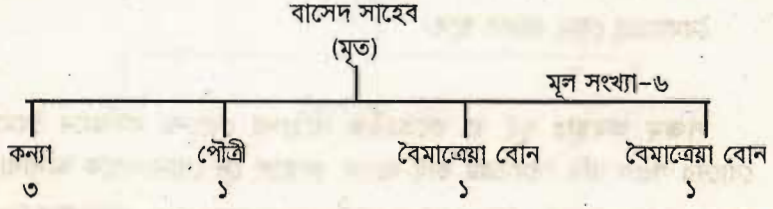

এমতাবস্থায়,

কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ,

পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং

প্রত্যেক বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে।

সপ্তম অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র বা তাদের অধঃস্তন, পিতা এবং দাদা জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। এ বিধান শুধুমাত্র বৈমাত্রেয়া বোনের ক্ষেত্রেই নয় বরং সহোদর বোনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়া সহোদর বোন যখন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে আসাবা হয়,তখনও বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ তারা

আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী। এ স্থলে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ দেয়া হল। যেমন– শহিদ সাহেব এক কন্যা, স্ত্রী, পিতা এবং একজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেলেন।

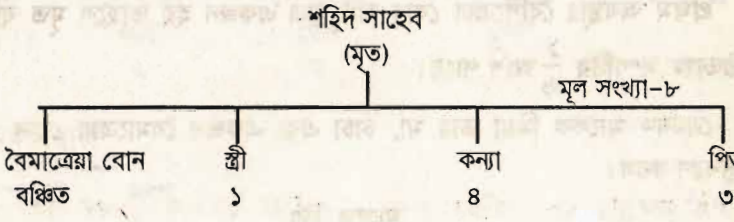

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ,

কন্যা পাবে $\frac{৪}{৮}$ অংশ এবং

পিতা পাবে $\frac{৩}{৮}$ অংশ।

বৈমাত্রেয়া বোন এক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে।

* মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয়া বোনগণ ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি বৈমাত্রেয়া বোনগণের প্রতি রদ্দ হবে। অর্থাৎ বৈমাত্রেয়া বোনগণ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

বৈপিত্রেয়া বোনের অধিকার

বৈপিত্রেয়া ভাইয়ের ন্যায় বোনের তিন অবস্থাঃ যথা-

প্রথম অবস্থাঃ বৈপিত্রেয়া বোন যদি মাত্র একজন হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

যেমন- মালেক মিয়া তার মা, চাচা এবং একজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল।

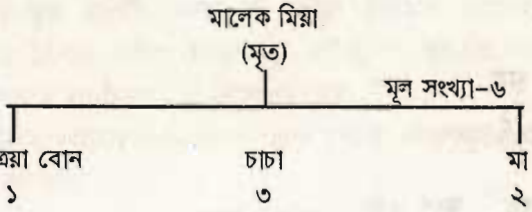

এমতাবস্থায়,

মা পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ,

বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং

চাচা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ বৈপিত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয়া বোনের সাথে বৈপিত্রেয়া ভাই থাকলে সবাই মিলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে এবং উক্ত অংশ ভাইবোন সকলেই নিজেদের মধ্যে সমান সমানভাবে ভাগ করে নিবে। বৈপিত্রেয়া ভাই বোনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের অংশই সমান।

যেমন- খালেক মিয়া মা, দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন, একজন বৈপিত্রেয় ভাই এবং চাচা রেখে মারা গেল।

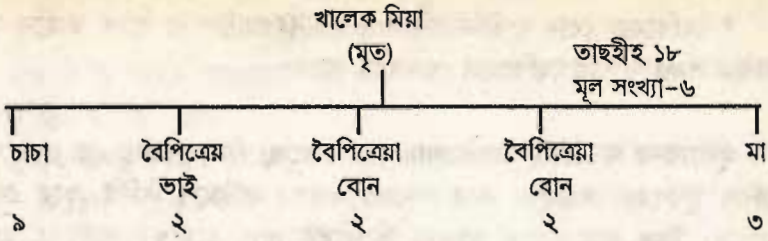

এমতাবস্থায়,

মা পাবেন $\frac{৩}{১৮}$ অংশ,

বৈপিত্রেয় ভাই পাবে $\frac{২}{১৮}$ অংশ,

প্রত্যেক বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{২}{১৮}$ অংশ করে এবং

চাচা পাবেন $\frac{৯}{১৮}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে কিংবা পিতা বা দাদা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়া বোন কোন অংশ পাবে না। যেমন- কাশেম স্ত্রী, কন্যা, বৈপিত্রেয়া বোন এবং পিতা রেখে মারা গেল।

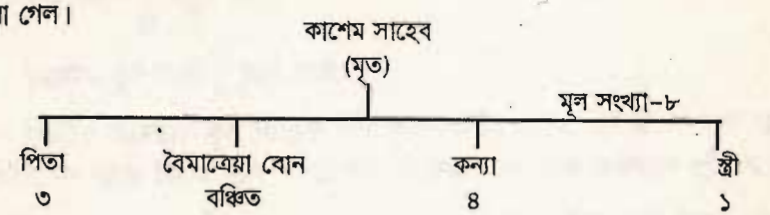

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ,

কন্যা পাবে $\frac{৪}{৮}$ অংশ,

পিতা পাবেন $\frac{৩}{৮}$ অংশ এবং

বৈপিত্রেয়া বোন বঞ্চিত হবে।

* বৈপিত্রেয়া বোন ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বৈপিত্রেয়া বোনগণই পাবে।

মূল্যায়নঃ উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, তিন ধরনের বোনদেরকেই যাবিল ফুরুজের অর্ন্তভুক্ত করে তাদের অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাইদেরকে আসাবা হিসেবেই রাখা হয়েছে। ভাইদের মধ্যে শুধুমাত্র বৈপিত্রেয় ভাইকে যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা মাতৃত্বের মর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়ার ইংগিতই বহন করে। ভাইদের অংশ নির্দিষ্ট না করে বোনদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া কী নারীর অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা নয়? নারী মুক্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণকে অনুরোধ করব, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী না হয়ে ইসলামকে ভালভাবে জানার এবং বুঝার চেষ্টা করুন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামই দিয়েছে নারীদের ন্যায্য অধিকার।

মাতার অধিকার

মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ব্যাপারে মাতার তিন অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তনিম্নের কেউ জীবিত থাকে অথবা যে কোন প্রকারের (সহোদর, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। যেমন– রহমত আলী দুই পুত্র, এক মেয়ে এবং মা জীবিত রেখে মারা গেল।

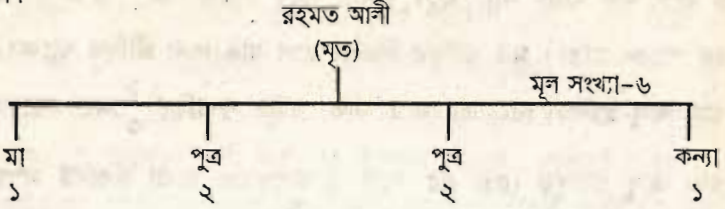

এমতাবস্থায়,

মা পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ,

কন্যা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং

প্রত্যেক পুত্র পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ হারে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র; কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তনিম্নের কেউই না থাকে কিংবা তিন প্রকার ভাইবোনের মধ্যে হতে কমপক্ষে দুইজন না থাকে, তাহলে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। যেমন– কালু মিয়া পিতা এবং মাতা রেখে মারা গেল।

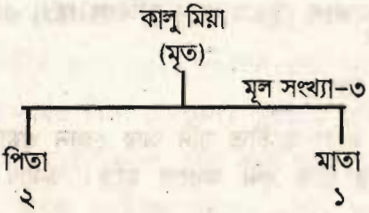

এমতাবস্থায়,

পিতা পাবেন $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং

মাতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তনিম্নের কেউ যদি না থাকে কিংবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাইবোনও না থাকে, কিন্তু পিতামাতা জীবিত থাকে– তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন মাতা। মৃত ব্যক্তির পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকেন তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে মাতা সমস্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে এ অবস্থায়ও মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। নিম্নে মাত্র একটি উদাহরণ পেশ করা হল। আহাদ সাহেব স্ত্রী, মাতা এবং দাদা রেখে মারা গেলেন।

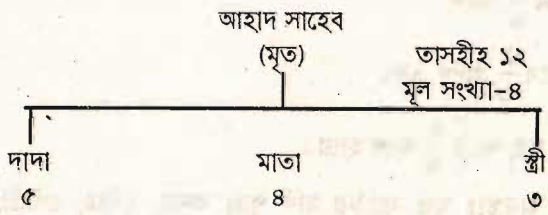

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{১২}$ অংশ,

মাতা পাবেন $\frac{৪}{১২}$ অংশ (ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে) এবং

দাদা পাবেন $\frac{৫}{১২}$ অংশ।

* মৃত ব্যক্তির মাতা ব্যতীত যদি আর কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে সমস্ত সম্পত্তি মাতার প্রতি রদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ মাতাই সমস্ত সম্পত্তি পাবেন।

মূল্যায়ন ও জবাব

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে মাতার অধিকার সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, মাতা এবং পিতা উভয়কেই যাবিল ফুরুজের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উভয়কে যাবিল ফুরুজ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হলেও অংশের পরিমাণের দিক দিয়ে পিতাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে মাত্র $\frac{১}{৬}$ অংশ। অপরদিকে মাতাকে দেয়া হয়েছে দু'টি অংশ যথা- $\frac{১}{৬}$ এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ। অর্থাৎ যাবিল ফুরুজ হিসেবে মাতার অংশের পরিমাণ বেশী। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ইসলাম মাতৃত্বের মর্যাদাকেও অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং মা হিসেবে নারীর অধিকারকেই ইসলাম প্রাধান্য দিয়েছে। উত্তরাধিকারিণী হিসেবে নারী জাতিকে ইসলাম পিছনের সারিতে ঠেলে দেয়নি বরং অগ্রভাগে রেখেছে। আমি আশা করি ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করবেন। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, মাতাকে বড় ভগ্নাংশ অর্থাৎ $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ দেয়া হলেও মাতার তুলনায় পিতাই তো সম্পত্তি বেশী পেয়ে থাকে। এ প্রসংগে আমি বলব, সম্পত্তির সবকিছু হিসেব করলে দেখা যাবে, পিতার তুলনায় মাতার সম্পত্তি কোন দিক দিয়েই কম নয়। মৃত পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতার তুলনায় পিতা যে অতিরিক্ত সম্পত্তিটুকু পেয়ে থাকেন তা যাবিল ফুরুজ হিসেবে নয় বরং আসাবা হিসেবে। এ অতিরিক্ত সম্পত্তিটুকু সব সময়ই পায় না বরং স্থান বিশেষে পেয়ে থাকেন। যাবিল ফুরুজের সবাই নেয়ার পর যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেটুকু পেয়ে থাকেন, অন্যথায় নয়। এটা কখনই সম্মানজনক প্রাপ্য নয়। মনে করুন জামান সাহেবের নিকট ৫টি বিদেশী ডায়েরী আছে। তিনি দুইটি ডায়েরী রহিমা ও হালিমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখে দিলেন এবং তাদেরকে দেয়ার জন্যে ডায়েরীর উপর তাদের নামও লিখে রাখলেন। আত্মীয় জমির উদ্দিন এসে নিজের প্রয়োজনে একটি ডায়েরী চেয়ে বলল, দয়া করে আমাকে একটি ডায়েরী দিন। কিন্তু জামান সাহেব তাকে ৩ টাকা দামের একটি বলপেন দিয়ে বললেন,

আপাততঃ এটা নিয়ে যাও। সবাইকে দিয়ে যদি বেশী হয় তাহলে ডায়েরী দিব। এখন বলুন, জমির উদ্দিনকে জামান সাহেবের ডায়েরী দেয়ার আশ্বাসকে কী কেউ মর্যাদা বলে আখ্যায়িত করবেন নাকি রহিমা ও হালিমাকেই প্রকৃত মর্যাদা দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করবেন? পরবর্তীতে জমির উদ্দিন যদি ভাগ্যক্রমে একটি ডায়েরী পেয়েও যায় তাহলে সে ডায়েরী ও কলম দুইটিই পেয়েছে বটে, কিন্তু এটাকে কখনো প্রকৃত মর্যাদার নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করা হবে না। সম্পদ এবং সম্মান দু'টি ভিন্ন জিনিস। ইসলাম নারীদেরকে সম্পদ এবং সম্মান দু'টিই দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী, কন্যা, বোন ও মা হিসেবে নারী জাতিকে ইসলাম যেমন সম্মান দিয়েছে তেমনিভাবে উত্তরাধিকারী হিসেবেও তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করেছে। মাতার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছেন পিতা। উপরন্ত সন্তানদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পাওয়া সাধারণ সম্মান নয়। মাতার এ শ্রেষ্ঠ সম্মান ও অধিকার দিয়েছে একমাত্র ইসলাম।

দাদীর অধিকার ও মূল্যায়ন

দাদীর দুই অবস্থা। যথা–

প্রথম অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা মাতা যদি বর্তমান না থাকে, তাহলে দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন।

যেমন– কামাল কন্যা, ভাই ও দাদী রেখে মারা গেল।

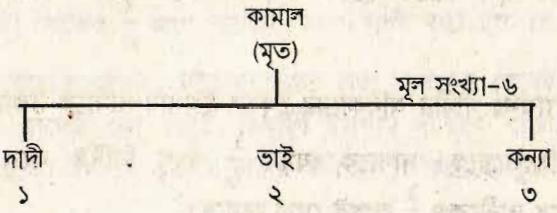

এমতাবস্থায়,

কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ,

দাদী পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং

ভাই পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ মৃত ব্যক্তির পিতা বা মাতা কেউ জীবিত থাকলে দাদী কোন অংশ পাবেন না। যেমন– বশীর স্ত্রী, পিতা ও দাদী রেখে মারা গেল।

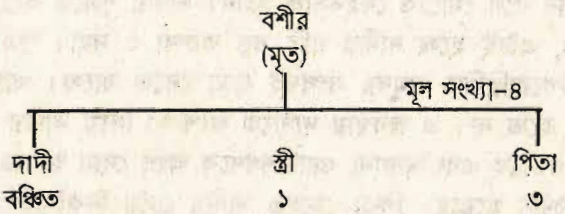

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ,

পিতা পাবেন $\frac{৩}{৪}$ অংশ এবং

দাদী বঞ্চিত হবেন।

* মৃত ব্যক্তির দাদী ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে দাদীর প্রতি রদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ দাদীই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

মূল্যায়নঃ দাদীর অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম দাদীকে ঠকায়নি বরং অন্যের তুলনায় জিতিয়েছে। দাদাকে যেমন $\frac{১}{৬}$ অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে দাদীকেও $\frac{১}{৬}$ অংশই দেয়া হয়েছে।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তির দাদা জীবিত নেই কিন্তু পিতা অর্থাৎ দাদীর পুত্র জীবিত আছে তাহলে দাদীর আর্থিক কোন চিন্তা থাকার কথা নয়। দাদার মৃত্যুর পর দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দাদী অংশ পেয়েছে। এছাড়া মোহরানার টাকা, দাদীর পিতা, মাতা, ভাই ও বোন থেকে প্রাপ্য সম্পদ তো আছেই। দাদা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তো দাদীর সমস্ত খরচ দাদাই বহন করেছেন। এ অবস্থায় নাতীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দাদীকে যদিও কোন অংশ দেয়া হয়নি কিন্তু নাতীর পিতা অর্থাৎ দাদীর পুত্র জীবিত রয়েছে। পুত্রের দায়িত্ব হল মাতার অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির দাদীর সেবাযত্ন সহ সমস্ত দায় দায়িত্ব বহন করা। যেহেতু পুত্রই তার মায়ের (মৃত ব্যক্তির দাদী) ভরণ পোষণের সকল ব্যবস্থা করবে কাজেই এ অবস্থায় দাদীকে নাতীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ দেয়া হয়নি বলে মোটেও বেইনসাফ হয়নি। দাদীর পুত্রকে আল্লাহ্ পাক জীবিত রেখেছেন, এটাই হচ্ছে দাদীর প্রতি বড় করুণা ও দয়া। পুত্র থাকার কারণে দাদীর উপরোল্লিখিত সমুদয় সম্পদই জমা থেকে যাচ্ছে। খরচ করার কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। এ অবস্থায় দাদীকে অংশ না দিয়ে দাদীর পুত্র অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পিতাকে এবং অন্যান্য ওয়ারিশগণকে অংশ দেয়া হয়েছে। এটা ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন হয়েছে। পিতা যেহেতু দাদীর চেয়ে নিকটবর্তী, তাই পিতাকে দেয়াটাই সমীচিন। এছাড়া দাদী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছেন। দায়িত্বও কমে আসছে। কাজেই আরো সম্পদ পাবার আকাঙ্খা না থাকাই স্বাভাবিক।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত নেই কিন্তু দাদা জীবিত রয়েছেন, তাহলেও দাদী তার খাওয়া দাওয়া ও চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচ পাচ্ছেন দাদার নিকট থেকে। ইতিপূর্বে তিনি দাদার নিকট থেকে মোহরানার অর্থও পেয়েছেন, সম্পূর্ণ পেয়ে না থাকলে অবশ্য পাবেন। এছাড়া দাদী তাঁর পিতা, মাতা, ভাই, বোন, কন্যা এবং পুত্র থেকেও অংশ পেয়েছেন, বা পাবেন। তাঁর এ সমস্ত সম্পদ সবই জমা রয়েছে এবং জমা থাকারই কথা। কারণ তাঁর খরচ করার কোন প্রয়োজন হয়নি। দাদাই তো সবকিছু দিচ্ছেন। উপরন্ত মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ নাতী থেকেও $\frac{১}{৬}$ অংশ পাচ্ছেন। অথচ দাদী বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। আর কত দিনই বা বেঁচে থাকবেন। তাঁর তো আর এত সম্পদের কোনই প্রয়োজন নেই। যা আছে তাতেই তো যথেষ্ট। তথাপি ইসলাম দাদীকে বঞ্চিত করেনি, নির্দিষ্ট অংশ দিয়েছে। ইসলাম এভাবে নারীর অধিকারকে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আসাবাগণের বর্ণনা

আসাবা ঐ সমস্ত লোকদেরকে বলা হয় যাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই। যাবিল ফুরুজদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি যারা পেয়ে থাকে অথবা যাবিল ফুরুজদের অবর্তমানে যারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাদেরকে আসাবা বলে।

আসাবা ২ প্রকার। যথা–

১) **আসাবায়ে নসবিয়া।** অর্থাৎ যারা মৃত ব্যক্তির সহিত বংশগত দিক দিয়ে সম্পর্কিত।

২) **আসাবায়ে সববিয়া।** অর্থাৎ যারা মৃত ব্যক্তির সহিত কারণ বশতঃ সম্পর্কিত। এ কারণ হচ্ছে আযাদ করা। এ ধরনের আসাবা বর্তমানে নেই।

আসাবায়ে নসবিয়া আবার ৩ প্রকার। যথা–

১। আসাবা বিনাফসিহিঃ ঐ সকল পুরুষ আসাবাকে বলা হয়, যাদেরকে মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক করলে মধ্যখানে কোন নারী সম্পর্কিত হয় না। এ ধরনের আসাবা ৪ প্রকার। যথা–

ক) মৃত ব্যক্তির অধঃস্তন পুরুষঃ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি।

খ) মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন পুরুষঃ পিতা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি।

গ) মৃত ব্যক্তির পিতার অধঃস্তন পুরুষঃ ভাই, ভাতিজা, ভাতিজার পুত্র ইত্যাদি।

ঘ) মৃত ব্যক্তির দাদার অধঃস্তন পুরুষঃ চাচা, চাচাত ভাই, চাচাত ভাইয়ের পুত্র ইত্যাদি।

আসাবা বিনাফসিহি–র উপরোক্ত ৪ প্রকার আসাবা এক সংগে উত্তরাধিকারী হবে না। 'ক' শ্রেণীর আসাবা জীবিত থাকলে 'খ', 'গ' ও 'ঘ' শ্রেণীর আসাবাগণ উত্তরাধিকারী হবে না। 'ক' শ্রেণীর অবর্তমানে উত্তরাধিকারী হবে 'খ' শ্রেণীর আসাবাগণ। 'গ' শ্রেণীর আসাবাগণ উত্তরাধিকারী হবে যদি 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর আসাবাগণ জীবিত না থাকে। অতঃপর 'ঘ' শ্রেণী উত্তরাধিকারী হবে। এভাবে ক্রম অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হবে। সুতরাং পুত্র বা পৌত্র জীবিত থাকলে পিতা বা দাদা আসাবা হিসেবে কোন অংশ পাবে না। কিন্তু যাবিল ফুরুজ

হিসেবে তাদের নির্ধারিত অংশ অবশ্যই পাবে। এছাড়া অন্যান্যরা অর্থাৎ ভাই, ভাতিজা, চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি যাবিল ফুরুজ নয়। কাজেই পুত্র বা পৌত্র জীবিত থাকলে তারা কোন অংশ পাবে না।

উপরোক্ত ৪ শ্রেণীর আসাবার মধ্যে আবার নিকটবর্তী আত্মীয়কে দূরবর্তী আত্মীয়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন পুত্র জীবিত থাকলে পৌত্র কোন অংশ পাবে না। কারণ পৌত্রের চেয়ে পুত্র অধিক নিকটবর্তী। এমনিভাবে পিতা জীবিত থাকলে দাদা, ভাই জীবিত থাকলে ভাতিজা এবং চাচা জীবিত থাকলে চাচাত ভাই কোন অংশ পাবে না।

২। আসাবা বিগায়রিহিঃ ঐ সকল স্ত্রীলোকদেরকে বলা হয়, যারা তাদের সমশ্রেণীর অর্থাৎ ভাইদের দ্বারা আসাবা হয়ে যায়। যেমন– কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয়া বোন। এ ৪ জন স্ত্রীলোকের সহিত তাদের ভাই জীবিত থাকলে তারা ভাইয়ের দ্বারা আসাবা হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হিসেবে অংশ পাবে।

৩। আসাবা মা'গায়রিহিঃ ঐ সকল স্ত্রীলোকদের বলা হয় যারা অন্য স্ত্রীলোকের কারণে আসাবা হয়। যেমন– সহোদর বোন এবং বৈমাত্রেয়া বোন। এ দু'শ্রেণীর নারী মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক কন্যা সন্তান জীবিত থাকলে, আসাবা হয়ে যাবে। কারণ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ফরমায়েছেন, "কন্যাদের সহিত বোনদেরকে আসাবা করে দাও।" এ অবস্থায় কন্যাদের যাবিল ফুরুজ হিসেবে নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা হিসেবে দু'প্রকার বোনগণ পাবে। তাদের মধ্যে আবার আত্মীয়তার গুরুত্ব হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হবে। অর্থাৎ দুই দিক দিয়ে সম্পর্কের আত্মীয় এক দিক দিয়ে সম্পর্কের আত্মীয় হতে প্রাধান্য পাবে। এ অবস্থায় সহোদর বোন জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না।

উপরোক্ত আসাবাগণের কেউ যদি জীবিত না থাকে তাহলে অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবিল ফুরুজগণের প্রতি রদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ যাবিল ফুরুজগণের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্পত্তি তাদের মধ্যে পুনরায় বন্টন করে দিতে হবে।

ওয়ারিশগণের মধ্যে অংশ বন্টনের নিয়ম

পবিত্র কোরআনে যাবিল ফুরুজদের জন্যে মোট ৬টি অংশ নির্ধারিত আছে। এ অংশগুলো দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

১ম শ্রেণীঃ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৮}$

২য় শ্রেণীঃ $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$।

এদের মূল সংখ্যা হলঃ ২,৩,৪,৬ ও ৮।

একাধিক যাবিল ফুরুজ একত্রিত হলে সর্বপ্রথম তাদের অংশের মূল সংখ্যা বের করে সংখ্যাগুলির ল, সা, গু বের করতে হবে। ঐ ল, সা, গু-ই হল প্রতিটি অংশের মূল সংখ্যা। এ হিসেবে উপরোক্ত ৬টি অংশের মূল সংখ্যা হবে ৭টি। যথা- ২,৩,৪,৬,৮,১২ ও ২৪। ফারায়েজের পরিভাষায় এ সংখ্যাগুলিকেই মাখরাজ বা মূল সংখ্যা বলা হয়।

* কোন মাসআলায় একজন মাত্র যাবিল ফুরুজ হলে তার অংশের সংখ্যাই হবে মূল সংখ্যা। এ মূল সংখ্যা হতে অংশটি দিয়ে দিলেই বন্টন সম্পন্ন হবে। যেমন- আছিয়া খাতুন স্বামী ও পুত্র রেখে মারা গেল।

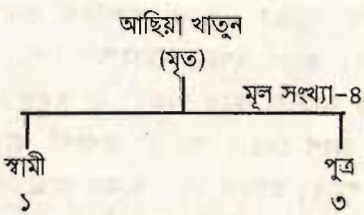

এমতাবস্থায়,

স্বামী হলেন যাবিল ফুরুজ এবং তার অংশ হল $\frac{১}{৪}$ অংশ। $\frac{১}{৪}$ অংশের মূল সংখ্যা হল ৪। পুত্র আসাবা। সুতরাং মোট সম্পত্তিকে ৪ ভাগ করে স্বামীকে দেয়া হবে ১ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৩ ভাগ পুত্রকে দেয়া হবে।

* যদি কোন মাসআলায় একাধিক যাবিল ফুরুজ থাকে তাহলে দেখতে হবে তাদের অংশ উপরোক্ত একই শ্রেণীভুক্ত কিনা। যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয় তাহলে মোট সম্পত্তিকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অংশের মূল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে।

যেমন– আসিফ স্ত্রী, কন্যা ও ভাই রেখে মারা গেল।

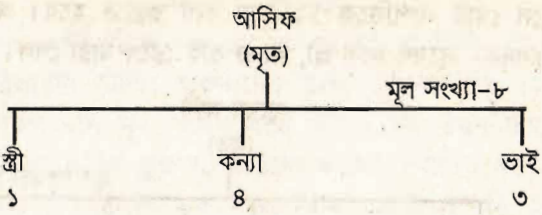

এখানে স্ত্রী ও কন্যা হল যাবিল ফুরুজ এবং ভাই হল আসাবা। স্ত্রী ও কন্যার অংশের পরিমাণ হল যথাক্রমে $\frac{১}{৮}$ ও $\frac{১}{২}$ অংশ। এ দু'টি অংশই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অংশ হল $\frac{১}{৮}$ । অতএব, মূল সংখ্যা ৮ দিয়ে মোট সম্পত্তিকে ভাগ করতে হবে। ফলে $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে স্ত্রী, $\frac{৪}{৮}$ অংশ পাবে কন্যা এবং অবশিষ্ট $\frac{৩}{৮}$ অংশ পাবে ভাই।

* কোন মাসআলায় যদি ১ম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীর সাথে ২য় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী একত্রে থাকে তাহলে অন্য নিয়মে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। তা এ যে, ১ম শ্রেণীর $\frac{১}{২}$ এর সাথে ২য় শ্রেণীর এক বা একাধিক অংশ একত্রে থাকলে মোট সম্পত্তিকে ৬ দ্বারা ভাগ করতে হবে। যেমন– আসিফ মা, কন্যা এবং চাচা রেখে মারা গেল।

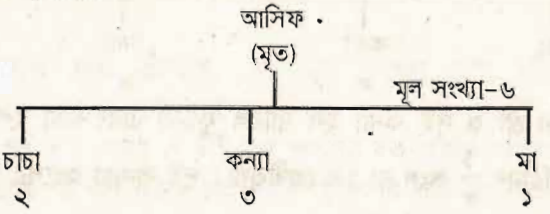

এখানে কন্যা ও মা হল যাবিল ফুরুজ এবং চাচা হল আসাবা। কন্যার অংশের পরিমাণ হল $\frac{১}{২}$ অংশ যা ১ম শ্রেণীভুক্ত। মাতার অংশের পরিমাণ হল $\frac{১}{৬}$ অংশ যা ২য় শ্রেণীভুক্ত। অতএব, ১ম শ্রেণীর অংশের সাথে ২য় শ্রেণীর অংশ একত্রে পাওয়া গিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে মোট সম্পত্তিকে ৬ দ্বারা ভাগ করে এর ৩ ভাগ কন্যাকে, ১ ভাগ মাকে এবং অবশিষ্ট ২ ভাগ চাচাকে দেয়া হবে।

* যদি ১ম শ্রেণীর $\frac{১}{৪}$ এর সাথে ২য় শ্রেণীর এক বা একাধিক অংশ একত্রে থাকে তাহলে মোট সম্পত্তিকে ১২ দ্বারা ভাগ করতে হবে। অর্থাৎ মূল সংখ্যা হবে ১২। যেমন– সুবেদ আলী স্ত্রী, মা ও ভাই রেখে মারা গেল।

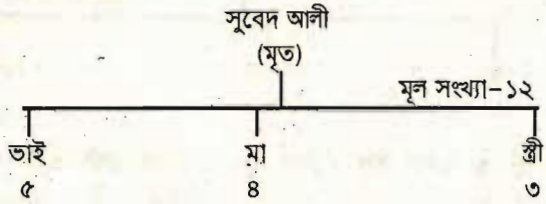

এখানে স্ত্রী ও মা হল যাবিল ফুরুজ এবং ভাই হল আসাবা। স্ত্রীর অংশের পরিমাণ হল $\frac{১}{৪}$ অংশ যা ১ম শ্রেণীভুক্ত। মায়ের অংশের পরিমাণ $\frac{১}{৩}$ অংশ যা ২য় শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং মূল সংখ্যা হবে ১২। মোট সম্পত্তিকে ১২ দিয়ে ভাগ করে স্ত্রীকে দিতে হবে ৩ ভাগ, মাকে ৪ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ পাবে ভাই।

* যদি ১ম শ্রেণীর $\frac{১}{৮}$ অংশের সাথে ২য় শ্রেণীর যে কোন একটি অংশ পাওয়া যায় তাহলে মূল সংখ্যা হবে ২৪ অর্থাৎ মোট সম্পত্তিকে ২৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন– কামাল সাহেব স্ত্রী, দুই কন্যা এবং চাচা রেখে মারা গেল।

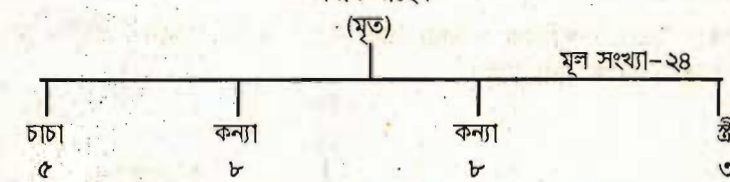

এখানে স্ত্রী ও দুই কন্যা হল যাবিল ফুরুজ এবং চাচা হল আসাবা। স্ত্রীর অংশের পরিমাণ $\frac{১}{৮}$ অংশ যা ১ম শ্রেণীভুক্ত। দুই কন্যার অংশের পরিমাণ $\frac{২}{৩}$ অংশ যা ২য় শ্রেণীভুক্ত। অতএব, মোট সম্পত্তিকে ২৪ দিয়ে ভাগ করে স্ত্রীকে দিতে হবে ৩ ভাগ, দুই কন্যাকে দিতে হবে ১৬ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ পাবে চাচা।

সুতরাং সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কোন মাসআলায় যদি আ'উল, রদ্দ, তাছহীহ ইত্যাদি না থাকে, তাহলে উপরোক্ত নিয়মে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে।

আ'উল নীতি

আ'উল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বৃদ্ধি হওয়া বা সীমা অতিক্রম করা। ফারায়েজের পরিভাষায় যাবিল ফুরুজদের অংশ প্রদানের পর তাদের প্রদত্ত অংশাবলীর যোগফল যদি মূল সংখ্যা হতে অধিক হয় তখন তাকে আ'উল বলে। কখনো কখনো যাবিল ফুরুজদের মধ্যে তাদের নির্ধারিত অংশ বন্টন করা হলে তাদের অংশের পরিমাণ মূল সংখ্যা তথা মোট সম্পত্তি হতে বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে যদি মূল সংখ্যাকেই ধরে সম্পত্তি বন্টন করা হয় তাহলে কেউ তার নির্ধারিত অংশ পাবে আবার কেউ পাবে না। এটি একটি জটিল সমস্যা। উদাহরণ স্বরূপ এক মহিলা স্বামী ও দুই বোন রেখে মারা গেল। এখানে স্বামী পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বোন পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ। এ অংশগুলির মূল সংখ্যা হল ৬। এখন সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করলে স্বামী পাবে ৩ ভাগ এবং দুই বোন পাবে ৪ ভাগ। মোট অংশ হবে (৩+৪)=৭ ভাগ। অথচ মোট সম্পত্তি হল ৬ ভাগ। ফলে দেখা যাচ্ছে মূল সংখ্যা থেকে ওয়ারিশদের অংশের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্যেই আ'উল নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাহল মূল সংখ্যাকে পরিবর্তিত করে ওয়ারিশদের অংশ অনুযায়ী তা বাড়িয়ে দেয়া। এমতাবস্থায় ৭ কে মূল সংখ্যা ধরে প্রত্যেক ওয়ারিশকে তার ন্যায্য অংশ দিতে হবে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বামী পাবে $\frac{৩}{৭}$ ভাগ এবং দুই বোন পাবে $\frac{৪}{৭}$ ভাগ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল সংখ্যা হল ৭টি। যথা– ২,৩,৪,৬,৮,১২ ও ২৪। এদের মধ্যে ২,৩,৪ ও ৮ এই চারটি মূল সংখ্যা কখনো আ'উল হয় না। কারণ এ ৪টি মূল সংখ্যার যত প্রকার মাসআলা রয়েছে তাদের কোনটিতেই আ'উল করার মত জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় না। বাকি ৩টি মূল সংখ্যা যথা– ৬,১২ ও ২৪ কখনো কখনো আ'উল হয়ে থাকে। ৬ এর আ'উল ৭,৮,৯ এবং ১০ পর্যন্ত হয়ে থাকে, ১২ এর আ'উল ১৩,১৫ এবং ১৭ এ তিনটি সংখ্যার মধ্যে হয়ে থাকে এবং ২৪ এর আ'উল মাত্র ২৭ হয়ে থাকে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ আউলের ৩টি মাসআলা পেশ করা হল।

১। ফরিদা বেগম স্বামী, একজন সহোদর বোন এবং দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল।

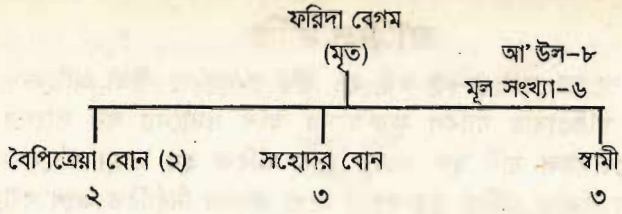

উপরোক্ত উদাহরণে স্বামী পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ, সহোদর বোন পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। এ সংখ্যাগুলির মূল সংখ্যা হল ৬। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ হচ্ছে (৩+৩+২)=৮ ভাগ যা মূল সংখ্যা হতে অধিক। এক্ষেত্রে আ' উল নীতি অবলম্বন করে মূল সংখ্যা ৬ কে পরিবর্তন করে তা ৮ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামী পাবে $\frac{৩}{৮}$ অংশ, সহোদর বোন পাবে $\frac{৩}{৮}$ অংশ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{২}{৮}$ অংশ।

২। আজিজ মিয়া স্ত্রী, দুইজন সহোদর বোন এবং দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল।

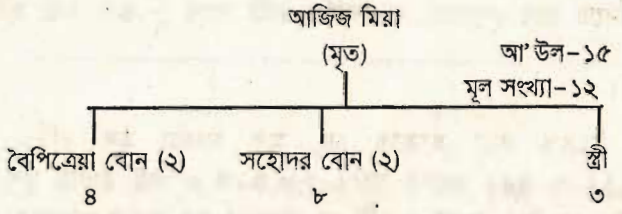

এক্ষেত্রে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৪}$ অংশ, দুই সহোদর বোন পায় $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোন পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ। এ সংখ্যাগুলির মূল সংখ্যা হল ১২। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ হচ্ছে (৩+৮+৪)=১৫ ভাগ যা মূল সংখ্যা হতে অধিক। সুতরাং এক্ষেত্রে আ' উল নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ মূল সংখ্যা ১২ কে পরিবর্তন করে ওয়ারিশগণের অংশ অনুযায়ী তা ১৫ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে হবে।

এমতাবস্থায়,

স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{১৫}$ অংশ,

দুই সহোদর বোন পাবে $\frac{৮}{১৫}$ অংশ এবং

দুই বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{৪}{১৫}$ অংশ।

৩। কবির সাহেব স্ত্রী, পিতা, মাতা এবং দুই কন্যা জীবিত রেখে মারা গেলেন।

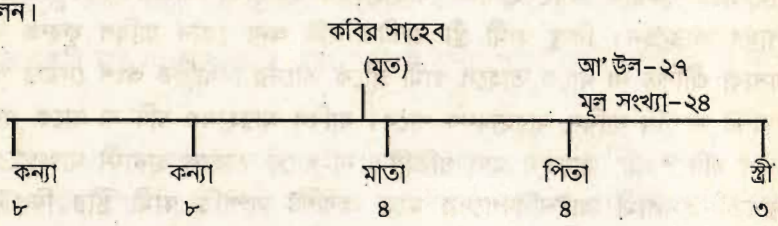

উপরোক্ত উদাহরণেও মূল সংখ্যা অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি হচ্ছে ২৪। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ হচ্ছে (৩+৪+৪+৮+৮)=২৭ ভাগ যা মূল সংখ্যা হতে অধিক।

এমতাবস্থায় আ' উল নীতি অবলম্বন করতঃ মূল সংখ্যা ২৪ কে ২৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে-

স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{২৭}$ ভাগ,

পিতা পাবে $\frac{৪}{২৭}$ ভাগ,

মাতা পাবে $\frac{৪}{২৭}$ ভাগ এবং

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৮}{২৭}$ ভাগ হারে।

উপরোক্ত মাসআলাটিকে মাসআলায়ে মিম্বরিয়া বলা হয়। এ নামকরণের কারণ এ যে, একদিন হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে খুৎবা প্রদানের জন্যে মিম্বারে আরোহণ করছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে উক্ত মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেন। হযরত আলী (রাঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়েই প্রশ্নটির সঠিক জবাব দেন। মিম্বারে দাঁড়ানো অবস্থায়ই মাসআলাটির উত্তর দেয়া হয় বলে তাকে "মাসআলায়ে মিম্বরিয়া" বলা হয়।

রদ্দ নীতি

রদ্দ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করা। ফারায়েজের পরিভাষায় যাবিল ফুরুজদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে এবং মৃত ব্যক্তির কোন আসাবা না থাকে তাহলে, অবশিষ্ট সম্পত্তি স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যাবিল ফুরুজদের নিকট তাদের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ প্রত্যাবর্তন নীতিকে রদ্দ নীতি বলা হয়। সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং হানাফী মাজহাবের ইসলামী আইনবিদগণ এ মত পোষণ করেছেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রী ব্যতীত যদি অন্য কোন যাবিল ফুরুজ বা আসাবা জীবিত না থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রীকে তাদের নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবিল আরহামগণ পাবে। যাবিল আরহামও যদি না থাকে এবং দেশে যদি শরয়ী' বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে হানাফী মাজহারেব পরবর্তী ইসলামী আইনবিদগণের মতে অবশিষ্ট সম্পত্তি স্বামী স্ত্রীর নিকটই পুনরায় রদ্দ অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। রদ্দ নীতি আ'উল নীতির বিপরীত। আ'উল নীতিতে ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ মূল সংখ্যা হতে অধিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রদ্দ নীতিতে মূল সংখ্যা ওয়ারিশগণের অংশের মোট পরিমাণ থেকে অধিক হয়ে থাকে।

রদ্দ নীতিতে ওয়ারিশগণের নিকট সম্পত্তি পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ৪টি নিয়ম রয়েছে। যথা–

১। কোন মাসআলায় যদি এক শ্রেণীর ওয়ারিশ জীবিত থাকে এবং স্বামী স্ত্রীর কেউ না থাকে তাহলে ওয়ারিশগণের সংখ্যাই মূল সংখ্যা হবে। অর্থাৎ যতজন ওয়ারিশ থাকবে, মোট সম্পত্তিকে তত ভাগ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক ওয়ারিশ তাদের ন্যায্য অংশ পাবে। যেমন– মালেক মিয়া দুই কন্যা রেখে মারা গেল। তার স্ত্রী জীবিত নেই।

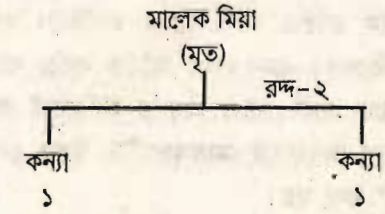

এখানে দুই কন্যার নির্ধারিত অংশের পরিমাণ হল $\frac{২}{৩}$ অংশ। এ হিসাবে মোট সম্পত্তিকে ৩ ভাগ করে ২ ভাগ দিতে হবে দুই কন্যাকে এবং ১ ভাগ বেশী হবে। যেহেতু অন্য কোন ওয়ারিশ নেই সেহেতু এ ক্ষেত্রে রদ্দ নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ অবশিষ্ট ১ ভাগকে আধা আধা করে দুই কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পত্তিকে দুইবার ভাগ না করে যদি উপরোক্ত পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ ওয়ারিশগণের সংখ্যা ২ দিয়ে যদি মোট সম্পত্তিকে ভাগ করা হয় তাহলে প্রত্যেক কন্যা তাদের ন্যায্য অংশ পাবে। এমতাবস্থায় মূল সংখ্যা হবে ২ এবং প্রত্যেক কন্যা পাবে মোট সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ হারে।

২। কোন মাসআলায় যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর যাবিল ফুরুজ থাকে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেউ জীবিত না থাকে তাহলে ওয়ারিশগণের অংশ অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করা হবে। ওয়ারিশগণ ($\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬}$) = $\frac{২}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে মোট সম্পত্তিকে ২ দ্বারা ভাগ করতে হবে। $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে ৩ দ্বারা, $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে ৪ দ্বারা ভাগ করতে হবে। কোন মাসআলায় $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে অথবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{২}{৬}$ অংশ প্রাপক হলে অথবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপক হলে মোট সম্পত্তিকে ৫ দ্বারা ভাগ করে তাদের ন্যায্য অংশ প্রদান করতে হবে। যেমন– এক ব্যক্তি কন্যা ও মা জীবিত রেখে মারা গেল।

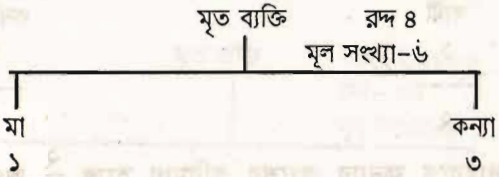

এখানে কন্যা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং মা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ। অতএব, মূল সংখ্যা হবে ৬। কিন্তু ওয়ারিশগণের অংশের পরিমাণ হচ্ছে (৩+১)=৪ ভাগ। মূল সংখ্যা অধিক হওয়ায় এবং কোন আসাবা না থাকায় এক্ষেত্রে রদ্দ নীতি অবলম্বন

করতে হবে। যেহেতু এক্ষেত্রে ওয়ারিশগণ $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপ্য হয়েছে সেহেতু ওয়ারিশগণের অংশের পরিমাণ (৩+১)=৪ দিয়ে সমস্ত সম্পত্তিকে ভাগ করতে হবে।

এমতাবস্থায়,

বোন পাবে $\frac{৩}{৪}$ অংশ এবং

মা পাবেন $\frac{১}{৪}$ অংশ।

৩। কোন মাসআলায় যদি এক শ্রেণীর যাবিল ফুরুজ থাকে যাদের উপর সম্পত্তি রদ্দ হয় এবং তাদের সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রীও থাকে তাহলে সর্বপ্রথম স্বামী বা স্ত্রীর অংশের মূল সংখ্যা অনুযায়ী মোট সম্পত্তিকে ভাগ করে তাদের অংশ দিয়ে দিতে হবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশ সম্পত্তি যাদের উপর রদ্দ হবে তাদের সংখ্যার সমান যদি হয় তাহলে তাই দিয়ে দিতে হবে। আর যদি তাদের সংখ্যার সমান না হয় তাহলে দেখতে হবে তাদের সংখ্যাটি অবশিষ্টাংশ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা। যদি বিভাজ্য হয় তাহলে ভাগফল দিয়ে মূল সংখ্যা এবং ওয়ারিশদের অংশকে গুণ করতে হবে। আর যদি নিঃশেষে বিভাজ্য না হয় তাহলে তাদের সংখ্যার সমষ্টিকে মূল সংখ্যায় এবং অংশে গুণ করতে হবে। তাহলেই প্রত্যেক ওয়ারিশ তাদের ন্যায্য অংশ পাবে। উদাহরণ স্বরূপ একজন মহিলা স্বামী ও ৬ কন্যা জীবিত রেখে মারা গেলেন।

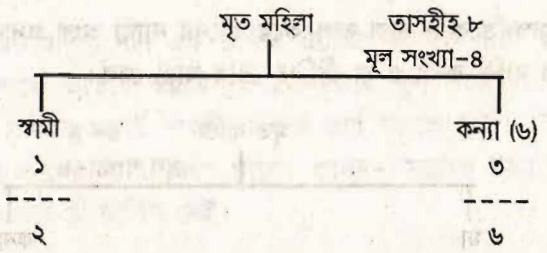

প্রদত্ত উদাহরণে কন্যার অংশের পরিমাণ হচ্ছে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং স্বামীর অংশের পরিমাণ হচ্ছে $\frac{১}{৪}$ অংশ। এ হিসেবে মূল সংখ্যা হবে ১২ এবং ওয়ারিশদের অংশের পরিমাণ হবে (৮+৩)=১১ ভাগ। অংশের পরিমাণের চেয়ে মূল সংখ্যা অধিক থাকায় এক্ষেত্রে রদ্দ নীতি অবলম্বন করতে

হবে। উপরের সূত্রানুযায়ী স্বামীর অংশের মূল সংখ্যা অনুযায়ী ৪ দিয়ে মোট সম্পত্তিকে ভাগ করে স্বামীকে $\frac{১}{৪}$ অংশ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৩ ভাগ দেয়া হয়েছে কন্যাদের। কিন্তু তাদের অংশ অর্থাৎ ৩ ভাগ তাদের সংখ্যার সমান নয়। কিন্তু ৩ দ্বারা ৬ সংখ্যাটি বিভাজ্য এবং ভাগফল হচ্ছে ২। অতএব, ২ দিয়ে মূল সংখ্যা ৪, স্বামীর অংশ ২ এবং কন্যাদের অংশ ৩ কে গুণ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়,

স্বামী পাবে $\frac{২}{৮}$ ভাগ এবং ৬ কন্যা পাবে $\frac{৬}{৮}$ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পাবে মোট সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ ভাগ হারে।

৪। কোন মাসআলায় যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর যাবিল ফুরুজ থাকে যাদের উপর সম্পত্তি রদ্দ হয় এবং তাদের সাথে স্বামী বা স্ত্রীও থাকে তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর নিম্নতম অংশ হতে মূল সংখ্যা নির্ধারণ করে সর্ব প্রথম স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দিতে হবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশ যদি অন্যান্য যাবিল ফুরুজদের নির্ধারিত অংশের সাথে মিলে যায় তাহলে তো উত্তমই। আর যদি না মিলে তাহলে যাদের উপর রদ্দ হয় তাদের অংশের পূর্ণ সংখ্যাকে মূল সংখ্যার সাথে এবং স্বামী বা স্ত্রীর অংশের সাথে গুণ করতে হবে। অতঃপর স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট ছিল তাদ্বারা অন্যান্য যাবিল ফুরুজদের অংশকে গুণ করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক ওয়ারিশ তাদের ন্যায্য অংশ পাবে। যেমন– এক ব্যক্তি স্ত্রী ৪, কন্যা ৯ এবং দাদী–নানী ৬ রেখে মারা গেল।

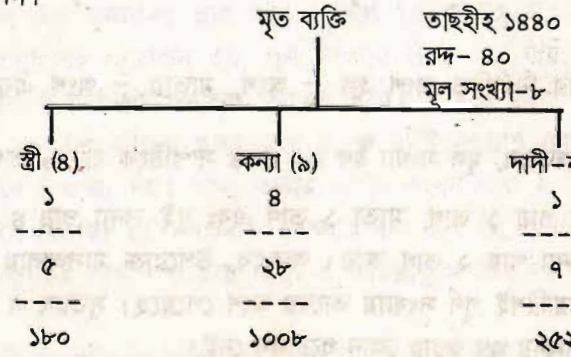

অংশ বন্টন শুদ্ধিকরণ নীতি

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে তাদের নির্ধারিত অংশানুযায়ী বন্টন করার ক্ষেত্রে যদি একই শ্রেণীর একাধিক উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশের সৃষ্টি হয় তাহলে যে সকল নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভগ্নাংশ ব্যতীরেকেই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ তাদের সংখ্যানুযায়ী সমভাবে পূর্ণ সংখ্যার দ্বারা বন্টন করা যায় তাকে ফারায়েজের পরিভাষায় তাছহীহ বলে। তাছহীহ অর্থাৎ বন্টন শুদ্ধিকরণে সাধারণত গুণের সাহায্য নিতে হয়। বন্টন শুদ্ধিকরণের জন্যে মোট ৭টি নিয়ম বা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি নিয়মকে অনুসরণ করতে হয় উত্তরাধিকারীগণের নির্ধারিত অংশ এবং তাদের সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। আর বাকি ৪টি নিয়ম অনুসরণ করতে হয় বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। নিম্নে ৭টি নিয়ম উদাহরণসহ পেশ করা হল।

১। প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্য অংশ যদি তাদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় বন্টন হয়ে যায় এবং প্রাপ্য অংশে কোন ভগ্নাংশের সৃষ্টি না হয় তাহলে গুণ করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন– ওয়াহিদ সাহেব মৃত্যুকালে পিতা, মাতা এবং দুই কন্যা রেখে যান।

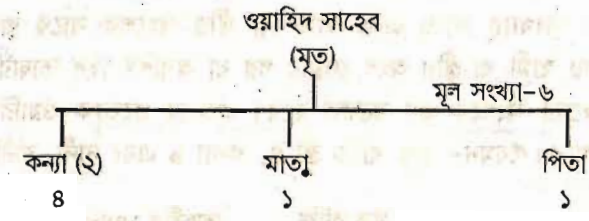

এখানে পিতার নির্ধারিত অংশ হল $\frac{১}{৬}$ অংশ, মাতার $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং দুই কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ। অতএব, মূল সংখ্যা হল ৬। সমস্ত সম্পত্তিকে যদি ৬ ভাগ করা হয় তাহলে পিতা পায় ১ ভাগ, মাতা ১ ভাগ এবং দুই কন্যা পায় ৪ ভাগ। অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পায় ২ ভাগ করে। অতএব, উপরোক্ত মাসআলায় সকল শ্রেণীর প্রত্যেক ওয়ারিশই পূর্ণ সংখ্যায় তাদের অংশ পেয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা না থাকায় গুণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

২। বিভিন্ন শ্রেণীর ওয়ারিশগণের মধ্যে যদি কেবলমাত্র এক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ তাদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় বন্টন না হয় অর্থাৎ প্রাপ্ত অংশে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়, তাহলে দেখতে হবে যে, তাদের সংখ্যা এবং তাদের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক রয়েছে কিনা। (তাওয়াফুকের সম্পর্ক এর অর্থ হল– দুইটি সংখ্যার মধ্যে একটি অপরটির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় কিন্তু তৃতীয় একটি সংখ্যা দ্বারা উভয় সংখ্যাই নিঃশেষে বিভাজ্য)। যদি তাওয়াফুকের সম্পর্ক থাকে তাহলে প্রাপ্ত অংশে ভগ্নাংশ হয় এরূপ ওয়ারিশগণের সংখ্যার ওফুক (অর্থাৎ সাধারণ গুণক) দিয়ে মূল সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। মূল সংখ্যা যদি আ'উল হয় তাহলে আউলের সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। যেমন– রাজ্জাক সাহেব মাতা, পিতা এবং ১০ জন কন্যা রেখে মারা গেলেন।

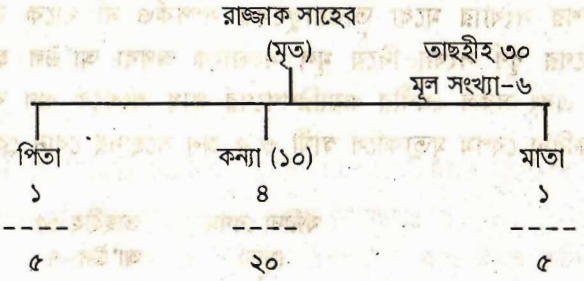

এখানে মাতার নির্ধারিত $\frac{১}{৬}$ অংশ, পিতার $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং ১০ জন কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ। এ অংশগুলির মূল সংখ্যা হল ৬। সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ দিয়ে ভাগ করায় মাতা পেয়েছেন ১ ভাগ, পিতা ১ ভাগ এবং ১০ জন কন্যা পেয়েছে ৪ ভাগ। উপরোক্ত ৩ শ্রেণীর ওয়ারিশগণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র ১ শ্রেণীর ওয়ারিশ তথা কন্যাদের প্রাপ্ত অংশ ৪ ভাগ ১০ কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিতে হলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়, পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করা যায় না। এমতাবস্থায় উপরোক্ত নিয়মটিকে অনুসরণ করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কন্যাদের সংখ্যা ১০ এবং তাদের প্রাপ্য অংশ ৪, এ দু'টি সংখ্যার একটি অপরটির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। কিন্তু তৃতীয় একটি সংখ্যা তথা ২ দিয়ে ১০ এবং ৪ নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। অতএব, এক্ষেত্রে বলা হবে যে, ১০ এবং ৪ এর মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক রয়েছে এবং এ তাওয়াফুক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২ সংখ্যা

দ্বারা। সুতরাং ২ দিয়ে যদি ১০ কে ভাগ করা হয় তাহলে ভাগফল হয় ৫। এ ৫ সংখ্যাটিকেই বলা হয় ওয়ারিশগণের সংখ্যার ওফুক। এখন ৫ দিয়ে মূল সংখ্যা ৬ কে এবং সকল শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। ফলে মোট সম্পত্তি হবে ৬ X ৫=৩০ ভাগ। পিতার অংশ হবে ১ X ৫=৫ ভাগ, মাতার অংশ ১ X ৫=৫ ভাগ এবং ১০ কন্যার অংশ হবে ৪ X ৫=২০ ভাগ। এখন কন্যাদের ২০ ভাগ সম্পত্তি ১০ কন্যার মধ্যে ভগ্নাংশ ব্যতীরেকেই ভাগ করে দেয়া যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যা পাবে ২ ভাগ করে। সুতরাং উপরোক্ত নিয়মটি অনুসরণ করায় ওয়ারিশগণের অংশের মানে কোন পরিবর্তনও হয়নি এবং অংশ বন্টনে কোন ভগ্নাংশেরও প্রয়োজন হয়নি।

৩। কেবলমাত্র এক শ্রেণী ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ যদি ওয়ারিশগণের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় বন্টন না হয় এবং ওয়ারিশগণের সংখ্যা ও তাদের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্কও না থাকে তাহলে এরূপ ওয়ারিশগণের পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে মূল সংখ্যাকে অথবা আ'উল হলে আউলের সংখ্যাকে এবং সকল শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। যেমন– ফরিদা বেগম মৃত্যুকালে স্বামী ও ৫ জন সহোদর বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল।

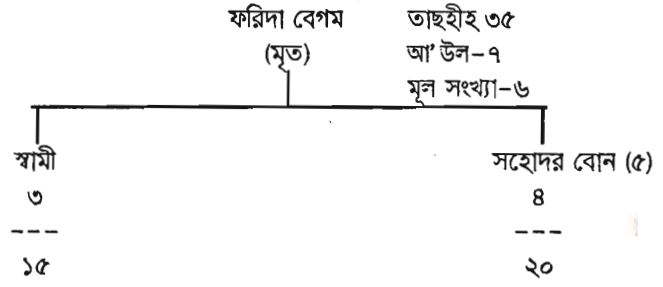

উক্ত মাসআলায় স্বামীর নির্ধারিত অংশ হচ্ছে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং ৫ জন সহোদর বোনের $\frac{২}{৩}$ অংশ। ফলে মূল সংখ্যা হয়েছে ৬। কিন্তু এ মাসআলাটিতে আ'উল নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে যা ইতিপূর্বে আ'উল নীতিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে স্বামী পেয়েছে $\frac{৩}{৭}$ ভাগ এবং ৫ জন সহোদর বোন পেয়েছে $\frac{৪}{৭}$ ভাগ। বোনদের সংখ্যা হচ্ছে ৫ এবং তাদের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যা

হচ্ছে ৪। ৫ জন বোনের মধ্যে ৪ সংখ্যাকে ভাগ করে দিতে হলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় ভগ্নাংশ ব্যতীরেকে যদি পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দিতে হয় তাহলে উল্লেখিত নিয়মটিকে অবশ্য অনুসরণ করতে হবে। নিয়মানুযায়ী দেখা যাচ্ছে ৪ এবং ৫ এর মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণের সংখ্যা ৫ কে আ'উল সংখ্যা ৭ এর সাথে এবং সকল ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশের সাথে গুণ করতে হবে। তাহলে আ'উল/মূল সংখ্যা হবে ৭ X ৫=৩৫। স্বামীর অংশ হবে ৩ X ৫ =১৫ ভাগ এবং সহোদর বোনদের অংশ হবে ৪ X ৫=২০ ভাগ। এখন ২০ কে ৫ জন বোনের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দেয়া যাবে অর্থাৎ প্রত্যেক বোন পাবে ৪ ভাগ করে। সুতরাং তাছহীহ করার ফলে,

পিতা পেয়েছেন $\frac{১৫}{৩৫}$ ভাগ এবং ৫ জন সহোদর বোন পেয়েছে $\frac{২০}{৩৫}$ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক বোনের প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ $\frac{৪}{৩৫}$ ভাগ। এতে ওয়ারিশগণের অংশের মানেরও কোন পরিবর্তন হয়নি।

যে ৪টি নিয়ম বিভিন্ন শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহল নিম্নরূপঃ

৪। দুই বা ততোধিক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ যদি তাদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করা না যায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার মধ্যে তামাছুলের সম্পর্ক থাকে তাহলে যে কোন এক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যা দ্বারা মূল সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। (তামাছুলের অর্থ হল– এক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যা অপর শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার সমান হওয়া)। যেমন– হানিফ সাহেব ৬ কন্যা, ৩ দাদী এবং ৩ চাচা রেখে মারা গেলেন।

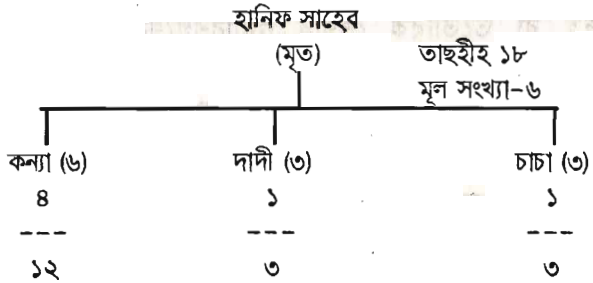

এখানে কন্যা এবং দাদী হল যাবিল ফুরুজ এবং চাচা হল আসাবা। কন্যার নির্ধারিত অংশ হল $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং দাদীর $\frac{১}{৬}$ অংশ। মূল সংখ্যা হবে ৬। অতএব, সমস্ত সম্পত্তিকে যদি ৬ ভাগ করা হয় তাহলে কন্যারা পাবে ৪ ভাগ, দাদীগণ ১ ভাগ এবং চাচাগণ আসাবা হিসেবে অবশিষ্ঠ ১ ভাগ পাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, সকল শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ তাদের সংখ্যার উপর পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করা যাচ্ছে না। যেমন- দাদীগণের প্রাপ্ত ১ ভাগ ৩ জন দাদীর মধ্যে ভাগ করে দিলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় ওয়ারিশগণের প্রত্যেকের অংশ ভগ্নাংশ ব্যতীরেকে ভাগ করে দিতে হলে উপরোক্ত নিয়মটিকে অবলম্বন করতে হবে। সূত্রানুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ওয়ারিশগণের লোকঁ সংখ্যা তথা কন্যা, দাদী ও চাচার সংখ্যা যথাক্রমে ৬,৩ এবং ৩। এদের পরস্পরের মধ্যে তামাছুলের সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, যে কোন এক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যা তথা ৩ কে মূল সংখ্যা ৬ এর সাথে এবং সকল শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশে গুণ করতে হবে। তাহলে মূল সংখ্যা হবে ৬ × ৩= ১৮। তিন চাচা পাবে ১ × ৩= ৩ ভাগ, তিন দাদী পাবে ১ × ৩ =৩ ভাগ এবং ছয় কন্যা পাবে ৪ × ৩= ১২ ভাগ। এখন প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ওয়ারিশকে পূর্ণ সংখ্যায় তাদের প্রাপ্ত অংশ ভাগ করে দেয়া যাবে। এতে অংশের মানেও কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ,

প্রত্যেক চাচা পাবে মূল সম্পত্তির $\frac{১}{১৮}$ ভাগ,

প্রত্যেক দাদী পাবে মূল সম্পত্তির $\frac{১}{১৮}$ ভাগ এবং

প্রত্যেক কন্যা পাবে মূল সম্পত্তির $\frac{২}{১৮}$ ভাগ হারে।

৫। দুই বা ততোধিক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার মধ্যে যদি তাদাখুলের সম্পর্ক হয় (তাদাখুলের সম্পর্ক এর অর্থ হল- দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে একটি অপরটির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়া) তাহলে বৃহত্তর সংখ্যা দিয়ে মূল সংখ্যা এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। যেমন- আব্দুর রহিম ৪ স্ত্রী, ৩ দাদী এবং ১২ চাচা রেখে মারা গেল।

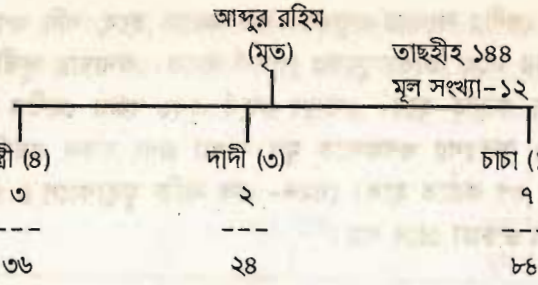

উপরোক্ত মাসআলায় তাছহীহ করার পূর্বে ৪ স্ত্রী পেয়েছিল $\frac{৩}{১২}$ ভাগ, ৩ দাদী $\frac{২}{১২}$ ভাগ এবং ১২ চাচা $\frac{৭}{১২}$ ভাগ। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাদের প্রাপ্ত অংশ প্রত্যেক ওয়ারিশ অর্থাৎ উত্তরাধিকারীকে ভগ্নাংশ ব্যতীরেকে পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দেয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাছহীহ এর উপরোক্ত সূত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সূত্রানুযায়ী দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিশ তথা স্ত্রী, দাদী এবং চাচা এর সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৩ এবং ১২। এদের মধ্যে তাদাখুলের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ৪ দ্বারা ১২ কে নিঃশেষে ভাগ করা যায়। আবার ৩ দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য। এমতাবস্থায় বৃহত্তর সংখ্যা ১২ দিয়ে মূল সংখ্যা এবং ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করতে হবে। এতে মূল সংখ্যা হবে ১২ x ১২ = ১৪৪ ভাগ। ৪ স্ত্রীর অংশ ৩ x ১২=৩৬ ভাগ, ৩ দাদীর ২ x ১২=২৪ ভাগ এবং ১২ চাচার ৭ x ১২ = ৮৪ ভাগ। এখন প্রত্যেক ওয়ারিশ পুর্ণ সংখ্যায় তাদের অংশ পাবে। অর্থাৎ,

প্রত্যেক স্ত্রী পাবে $\frac{৯}{১৪৪}$ ভাগ,

প্রত্যেক দাদী পাবে $\frac{৮}{১৪৪}$ ভাগ এবং

প্রত্যেক চাচা পাবে $\frac{৭}{১৪৪}$ ভাগ হারে।

৬। দুই বা ততোধিক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে যদি তাওয়াফুকের সম্পর্ক থাকে তাহলে এক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার ওফুক অর্থাৎ সাধারণ গুণক দিয়ে অপর শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। গুণফল

দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যার ওফুককে গুণ করতে হবে, যদি গুণফল ও তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক থাকে। অন্যথায় তৃতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। এভাবে চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। অতঃপর গুণফলকে মূল সংখ্যা এবং সকল ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশের সাথে গুণ করতে হবে। যেমন– এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ৪ স্ত্রী, ১৮ কন্যা, ১৫ দাদী এবং ৬ চাচা রেখে যায়।

মৃত ব্যক্তি — তাছহীহ ৪৩২০, মূল সংখ্যা–২৪

চাচা (৬)	দাদী (১৫)	কন্যা (১৮)	স্ত্রী (৪)
১	৪	১৬	৩
----	----	----	----
১৮০	৭২০	২৮৮০	৫৪০

উক্ত মাসআলায় ৪ স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ হল $\frac{১}{৮}$ অংশ, ১৮ কন্যার $\frac{২}{৩}$ অংশ, ১৫ দাদীর $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং ৬ চাচা হল আসাবা। উপরোক্ত অংশগুলির মূল সংখ্যা হচ্ছে ২৪। সমস্ত সম্পত্তিকে ২৪ ভাগ করায় স্ত্রীগণ পেয়েছে ৩ ভাগ, কন্যাগণ ১৬ ভাগ, দাদীগণ ৪ ভাগ এবং চাচাগণ আসাবা হিসেবে পেয়েছে অবশিষ্ট ১ ভাগ। কিন্তু ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ প্রত্যেক ওয়ারিশকে ভগ্নাংশ ব্যতীরেকে পূর্ণ সংখ্যায় ভাগ করে দেয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় উপরোক্ত নিয়মকে অনুসরণ করে ১৮০ দিয়ে মূল সংখ্যা ২৪ কে গুণ করায় মূল সংখ্যা হয়েছে ৪৩২০। তাছহীহ করার ফলে অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তিকে ৪৩২০ ভাগ করায় স্ত্রীগণ পেয়েছে ৫৪০ ভাগ, কন্যাগণ ১৮৮০ ভাগ, দাদীগণ ৭২০ ভাগ এবং চাচাগণ ১৮০ ভাগ। এতে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে পূর্ণ সংখ্যায় তাদের অংশ প্রদান করা যাবে।

৭। দুই বা ততোধিক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার পরস্পরের মধ্যে যদি তামাছুল, তাদাখুল বা তাওয়াফুকের সম্পর্ক না থাকে বরং তাবায়ুন অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে এক শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ২য় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। গুণফল দিয়ে ৩য় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করতে

হবে। এভাবে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করে গুণফল দিয়ে মূল সংখ্যা এবং সকল শ্রেণীর ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশের সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। যেমন– এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ২ স্ত্রী, ৬ দাদী, ১০ কন্যা এবং ৭ চাচা রেখে মারা গেল।

মৃত ব্যক্তি — তাছহীহ ৫০৪০, মূল সংখ্যা–২৪

চাচা (৭)	কন্যা (১০	দাদী (৬)	স্ত্রী (২)
১০	৬	৪	৩
----	----	----	----
২১০	৩৩৬০	৮৪০	৬৩০

উপরোক্ত নিয়মানুসারে তাছহীহ অর্থাৎ বন্টন শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভগ্নাংশ ব্যতীরেকেই পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা উত্তরাধিকারীগণের ন্যায্য অংশ প্রদান করা যাবে।

অর্থাৎ তাছহীহ করার ফলে এখন

প্রত্যেক স্ত্রী পাবে $\frac{৩১৫}{৫০৪০}$ অংশ,

প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{৩৩৬}{৫০৪০}$ অংশ,

প্রত্যেক দাদী পাবে $\frac{১৪০}{৫০৪০}$ অংশ এবং

প্রত্যেক চাচা পাবে $\frac{৩০}{৫০৪০}$ অংশ হারে।

মুনাসেখা

মুনাসেখা এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থানান্তর করা। ফারায়েজের পরিভাষায় কোন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করার পূর্বেই যদি কোন উত্তরাধিকারী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার মীরাসী সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হওয়াকে মুনাসেখা বলে।

এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ১ম মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ফারায়েজ করতে হবে এবং উহা হতে তার উত্তরাধিকারীদের অংশ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ২য় মৃত ব্যক্তিও ১ম মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অংশ পাবে। কারণ ১ম মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে ২য় মৃত ব্যক্তি জীবিত ছিল এবং উত্তরাধিকারীও হয়েছিল। সুতরাং ২য় মৃত ব্যক্তি ১ম মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর ২য় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ফারায়েজ করতে হবে এবং উহা হতে তার উত্তরাধিকারীদের অংশ প্রদান করতে হবে। এবার ২য় মৃত ব্যক্তির মাফিল ইয়াদ (১ম মৃত ব্যক্তি হতে যে অংশ পেয়েছিল উহা) বাম পার্শ্বে লিখতে হবে। এবার দেখতে হবে মাফিল ইয়াদ এবং ২য় ফারায়েজের মূল সংখ্যা অথবা তাছহীর সংখ্যার (মূল সংখ্যা সংশোধিত হয়ে থাকলে সংশোধিত সংখ্যার) সাথে কি সম্পর্ক। মাফিল ইয়াদ এর সংখ্যা যদি মূল সংখ্যা অথবা সংশোধিত সংখ্যার উপর সমানভাবে ভাগ হয়ে যায় তাহলে গুণ করার প্রয়োজন নেই। আর যদি মাফিল ইয়াদ এর সংখ্যা মূল সংখ্যা অর্থাৎ সংশোধিত সংখ্যার উপর সমানভাবে ভাগ না হয় তাহলে দেখতে হবে যে, মাফিল ইয়াদ এবং মূল সংখ্যা বা সংশোধিত সংখ্যার (সংশোধিত হয়ে থাকলে) মধ্যে তাওয়াফুক বা তাবায়ুনের সম্পর্ক কিনা। যদি তাওয়াফুকের (বিভাজ্য) সম্পর্ক হয় তাহলে ২য় ফারায়েজের মূল সংখ্যার বা সংশোধিত সংখ্যার (সংশোধিত হয়ে থাকলে) উফুক অর্থাৎ ভাগফল দিয়ে ১ম ফারায়েজের মূল সংখ্যাকে বা সংশোধিত সংখ্যাকে (সংশোধিত হয়ে থাকলে) এবং উহার অংশসমূহকে গুণ করতে হবে। আর মাফিল ইয়াদ এর ভাগফল দিয়ে ২য় ফারায়েজের অংশসমূহকে গুণ করতে হবে। মাফিল ইয়াদ এবং মূল সংখ্যার মধ্যে যদি তাওয়াফুকের সম্পর্ক না হয়ে তাবায়ুনের সম্পর্ক হয় অর্থাৎ অবিভাজ্য সম্পর্ক হয়, তাহলে ২য় ফারায়েজের মূল অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ১ম ফারায়েজের মূল অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যাকে এবং ১ম ফারায়েজের অংশসমূহকে গুণ করতে হবে। সাথে সাথে ২য় ফারায়েজের মাফিল ইয়াদ এর পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ২য় ফারায়েজের অংশসমূহকেও গুণ করতে হবে। এমনিভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ফারায়েজের কাজ করতে হবে। সবসময় শেষ ফারায়েজকে ২য় ফারায়েজের

পর্যায়ে ধরতে হবে এবং ১ম ফারায়েজকে ১ম এবং ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম ফারায়েজের অংশসমূহকে পর্যায়ক্রমে ১ম ফারায়েজের পর্যায়ে ধরতে হবে। সর্বশেষে ১ম ফারায়েজের গুণফলই পরবর্তী সকল ফারায়েজের অংশসমূহের মাখরাজ বা মূল সংখ্যা হিসেবে গণ্য হবে।

উদাহরণ স্বরূপ করিম মৃত্যুকালে স্ত্রী–রিনা, মাতা–ফরিদা, দুই সহোদর বোন–নাসিমা ও খালেদা এবং এক বৈপিত্রেয়া বোন বিলকিস–কে রেখে যায়। করিমের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উপরোক্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হবার পূর্বেই খালেদা মারা যায়। খালেদা মৃত্যুকালে স্বামী–হাসেম, মাতা–ফরিদা, সহোদর বোন–নাসিমা এবং বৈপিত্রেয়া বোন বিলকিস–কে রেখে যায়। অতঃপর ফরিদা মারা যায়। ফরিদা মৃত্যুকালে দুই কন্যা–নাসিমা ও বিলকিস এবং বোন–আকলিমা–কে রেখে যায়। এমতাবস্থায় উপরোক্ত সম্পত্তি উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করা হবে।

বন্টন পদ্ধতির জন্যে নিম্নের ছকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে–

করিম

মুনাসেখা ৯০
মুনাসেখা ৩০
আ'উল ১৫
মূল সংখ্যা–১২

রিনা (স্ত্রী)	ফরিদা (মাতা)	নাসিমা (সহোদর বোন)	খালেদা সহোদর বোন	আকলিমা (বৈপিত্রেয়া বোন)
৩	২	৪	৪	২
----	----	----	মৃত	----
৬	৪	৮		৪
----	----	----		----
৪	মৃতা	২৪		১২

খালেদা

মাফিল ইয়াদ ৪

আ'উল ৮
মূল সংখ্যা–৬

হাসেম (স্বামী)	ফরিদা (মাতা)	নাসিমা (সহোদর বোন)	বিলকিস (বৈপিত্রেয়া বোন)
৩	১	৩	১
----		----	----
৯	মৃতা	৯	৩

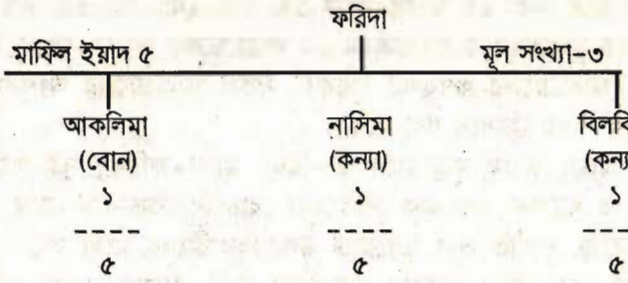

অতএব, উপরোক্ত ফারায়েজে যারা জীবিত আছে

গুণফল বা পূর্ণসংখ্যা মোট ৯০

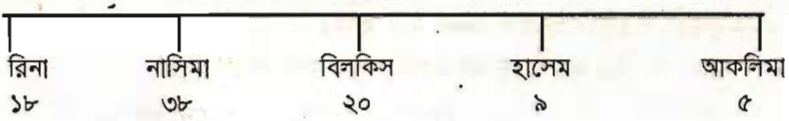

এমতাবস্থায় উল্লেখিত ফারায়েজে অর্থাৎ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে- রিনা পাবে $\frac{১৮}{৯০}$ ভাগ, নাসিমা পাবে $\frac{৩৮}{৯০}$ ভাগ, বিলকিস পাবে $\frac{২০}{৯০}$ ভাগ, হাসেম পাবে $\frac{৯}{৯০}$ ভাগ এবং আকলিমা পাবে $\frac{৫}{৯০}$ ভাগ।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

এ পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত যে সকল ইসলামী আইন এবং ফারায়েজ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করার নিয়ম পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে তা ভালভাবে আয়ত্ব করার পর যে কেউ ইচ্ছে করলে ফারায়েজ করতে পারবে। মিরাস বন্টন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মৃত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারীর নাম যেন বাদ না পড়ে। তাই কেউ যদি ফারায়েজ করতে চায় কিংবা অন্য কেউ যদি ফারায়েজ করানোর জন্যে আসে তাহলে সর্বপ্রথমে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের নাম সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং কার পূর্বে কে মৃত্যুবরণ করেছে তার ক্রম অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। নতুবা মিরাস বন্টন নির্ভুল হবে না। অনেক সময় দেখা যায়, আগন্তক ব্যক্তি এসে যে সকল উত্তরাধিকারীগণের নাম বলে থাকেন তারই ভিত্তিতে মুসতাখরিজ (যিনি ফারায়েজ করেন) ফারায়েজ করে থাকেন। এতে মিরাস বন্টনে ভুল হবার এবং অন্যের ন্যায্য অধিকার খর্ব করার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ কোন্ কোন্ ব্যক্তি মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবে তা আগন্তকের সম্পূর্ণভাবে জানা নাও থাকতে পারে। সুতরাং আগন্তক ব্যক্তি এমন লোকের নামও ভুলক্রমে বলতে পারে, যে প্রকৃত পক্ষে উত্তরাধিকারী নয়। আবার যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে উত্তরাধিকারী হবে তার নাম হয়তোবা মনের অজান্তে নাও বলতে পারে। তাই যিনি ফারায়েজ করবেন তার উচিত নির্ভুল ফারায়েজ করার লক্ষ্যে আগন্তক ব্যক্তির নিকট থেকে নিজে জিজ্ঞেস করে প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণের নাম লিপিবদ্ধ করা। তাই প্রথমে ১২ প্রকার যাবিল ফুরুজদের নাম এক এক করে জিজ্ঞেস করে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অতঃপর আসাবাগণের নাম ক্রম অনুসারে জিজ্ঞেস করে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যদি যাবিল ফুরুজ অথবা আসাবাদের কেউ জীবিত থাকে তাহলে যাবিল আরহামগণের নাম জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাবিল ফুরুজ অথবা আসাবাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকলে যাবিল আরহামগণ উত্তরাধিকারী হবে না। যদি এদের মধ্যে কেউই জীবিত না থাকে তাহলে যাবিল আরহামগণের নাম জিজ্ঞেস করে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কখনো কখনো প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণের তালিকা তৈরীর জন্যে প্রয়োজনবোধে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর সম্পর্কও জিজ্ঞেস করতে হয়। এমনিভাবে প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণের তালিকা তৈরী করে ইতিপূর্বে বর্ণিত ইসলামী আইন ও নিয়ম পদ্ধতির ভিত্তিতে

ফারায়েজ করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভ করার ব্যাপারে আগন্তক ব্যক্তি কিংবা সমাজের লোকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকে তাহলে মিরাস বন্টন শেষে সে বিষয়টির সঠিক সমাধান ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে দেয়া উত্তম। এতে ফেৎনা সৃষ্টি হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের দেশে এক এক এলাকায় জমিনের এক এক ধরনের মাপ চালু রয়েছে। যেমন- অংকের ভগ্নাংশ, পয়সা-টাকা, কড়া-গন্ডা, শতাংশ-কানি, কাঠা-বিঘা ইত্যাদি। সুতরাং যে মাপে মিরাস বন্টন করলে এলাকা ভিত্তিক সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে, সে মাপেই মিরাস বন্টন করে দেয়া উত্তম।

নিম্নে পাঠক পাঠিকাগণের সুবিধার্তে কয়েকটি মাপ ও পরিমাপের তালিকা তুলে দেয়া হলো।

দেশীয় ওজন পরিমাপ	দেশীয় বর্গ পরিমাপ
৪ কাঁচ্চা = ১ ছটাক	১ বর্গহাত = ১ গন্ডা
৫ তোলা = ১ ছটাক	৪ বর্গহাত বা ৪ গন্ডা = ১ বর্গগজ
৪ ছটাক = ১ পোয়া	৫ বর্গগজ = ১ ছটাক
১৬ ছটাক = ১ সের	১৬ ছটাক = ১ কাঠা
৪০ সের = ১ মণ	২০ কাঠা = ১ বিঘা

৩ দন্তি = ১ ক্রান্তি
৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
৪ কড়া = ১ গন্ডা
২০ গন্ডা = ১ আনা/পণ/কানি/পাখি
১৬ আনা = ১ টাকা/কাহন/দোন/খাদা

ব্রিটিশ পদ্ধতি

দৈর্ঘ্যের একক মিটার,
ওজনের একক গ্রাম এবং
তরল পদার্থের ওজনের একক লিটার।

১ কিলোমিটার = ১০ হেক্টোমিটার
১ হেক্টোমিটার = ১০ ডেকামিটার
১ ডেকামিটার = ১০ মিটার
১মিটার = ১০ ডেসিমিটার
১ ডেসিমিটার = ১০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার

----

১০০ কিলোগ্রাম = ১ কুইন্টাল
১০০০ কিলোগ্রাম = ১ মেট্রিক টন।

ব্রিটিশ ওজন পরিমাপ

----

১৬ ড্রাম = ১ আউন্স
১৬ আউন্স = ১ পাউন্ড
২৮ পাউন্ড = ১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টার = ১ হন্দর
২০ হন্দর = ১ টন

ব্রিটিশ দৈর্ঘ্য মাপ

----

১২ ইঞ্চি = ১ ফুট
৩ ফুট = ১ গজ
১৮ ইঞ্চি = ১ হাত
২ হাত = ১ গজ
২২০ গজ = ১ ফার্লং
৮ ফার্লং বা ১৭৬০ গজ = ১ মাইল

১৪৪ বর্গইঞ্চি = ১ বর্গফুট
৯ বর্গফুট = ১ বর্গগজ
৪৮৪০ বর্গগজ = ১ একর

কতিপয় সাংকেতিক চিহ্ন

[illegible] = ১ দন্তি	// = ১ ছটাক	/।৬ = ১৬ সের
[illegible] = ২ দন্তি	/৵ = ২ ছটাক	/।৭ = ১৭ সের
/ = ১ ক্রান্তি	/৶ = ৩ ছটাক	/।৮ = ১৮ সের
// = ২ ক্রান্তি	/। = ৪ ছকাট	/।৯ = ১৯ সের
[illegible] = ১ কড়া	/৷৴ = ৫ ছটাক	/॥০ = ২০ সের
[illegible] = ২ কড়া	/।৵ = ৬ ছটাক	/॥১ = ২১ সের
[illegible] = ৩ কড়া	/।৶ = ৭ ছটাক	/॥২ = ২২ সের
[illegible] = ১ গন্ডা	/॥ = ৮ ছটাক	/॥৩ = ২৩ সের

১৯ = ১৯ গন্ডা	/।৴ = ৯ ছটাক	/।।৪ = ২৪ সের
/. = ১ আনা	/।।৵ = ১০ ছটাক	/।।৫ = ২৫ সের
৵. = ২ আনা	/।।৶ = ১১ ছটাক	/।।৬ = ২৬ সের
৶. = ৩ আনা	/৸• = ১২ ছটাক	/।।৭ = ২৭ সের
।• = ৪ আনা	/৸৴ = ১৩ ছটাক	/।।৮ = ২৮ সের
৴. = ৫ আনা	/৸৵ = ১৪ ছটাক	/।।৯ = ২৯ সের
।৵. = ৬ আনা	/৸৶ = ১৫ ছটাক	/৸• = ৩০ সের
।৶. = ৭ আনা	/১ = ১ সের	/৸১ = ৩১ সের
।।• = ৮ আনা	/২ = ২ সের	/৸২ = ৩২ সের
।৴. = ৯ আনা	/৩ = ৩ সের	/৸৩ = ৩৩ সের
।।৵. = ১০ আনা	/৪ = ৪ সের	/৸৪ = ৩৪ সের
।।৶. = ১১ আনা	/৫ = ৫ সের	/৸৫ = ৩৫ সের
৸• = ১২ আনা	/৬ = ৬ সের	/৸৬ = ৩৬ সের
৸৴. = ১৩ আনা	/৭ = ৭ সের	/৸৭ = ৩৭ সের
৸৵. = ১৪ আনা	/৮ = ৮ সের	/৸৮ = ৩৮ সের
৸৶. = ১৫ আনা	/৯ = ৯ সের	/৸৯ = ৩৯ সের
১৲ = ১ টাকা	/১• = ১০ সের	/১ = ১ মণ
	/১১ = ১১ সের	
	/১২ = ১২ সের	
১৪ আনা ৫ গন্ডা ২ কড়া	/১৩ = ১৩ সের	
১ ক্রান্তি ২ দন্তি	/১৪ = ১৪ সের	
=৸৵.৫ ।। /২	/১৫ = ১৫ সের	

৭ আনা ১২ গন্ডা ৩ কড়া	১২ সের ৭ ছটাক = /১২।৶
২ ক্রান্তি ১ দন্তি	৩৪ সের ১০ ছটাক = /৸৪।।৵
=।৶১২ ৩ //১	১ মণ ৫ সের ৮ ছটাক = ১/৫।।

এবার কিভাবে ফারায়েজ করতে হবে তা নিম্নে প্রশ্নোত্তর আকারে একটি ফারায়েজ করে দেখানো হলো।

প্রশ্নঃ ফরিদা পারভীন মৃত্যুকালে স্বামী- আরিফ সাহেব, পুত্র-সিদ্দিক, কন্যা-ফাতেমাকে এবং নিম্নলিখিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রেখে যান। অতঃপর প্রায় ১ বৎসর পর স্বামী-আরিফ সাহেবও মারা যান। আরিফ সাহেব মৃত্যুকালে মাতা-খোদেজা বেগম, পুত্র-সিদ্দিক এবং কন্যা-ফাতেমাকে রেখে যান। ফরিদা পারভীনের সম্পত্তির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ফসলী জমি ২ বিঘা	= টাকা	১,৩০,০০০/-
এক তলা পাকা বাড়ী	= টাকা	৪,৫০,০০০/-
স্বর্ণালংকার ৩ ভরি	= টাকা	১৮,০০০/-
অন্যান্য	= টাকা	১৪,০০০/-

	মোট টাকা	৬,১২,০০০/-

(টাকা ছয় লক্ষ বার হাজার) মাত্র

উল্লেখ্য যে, আরিফ সাহেবের এক ভাই-খালেদ সাহেব জীবিত আছেন। তিনিও উপরোক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবেন বলে দাবী করছেন। এমতাবস্থায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কে কত অংশ পাবে এবং খালেদ সাহেব কোন অংশ পাবেন কি?

জবাবঃ

মোট সম্পদ টাকা = ৬,১২,০০০/-
ফরিদা পারভীন
মৃত
মুনাসেখা ৭২
মূল সংখ্যা-৪

আরিফ সাহেব (স্বামী)	সিদ্দিক (পুত্র)	ফাতেমা (কন্যা)
১	২	১
----	----	----
	৩৬	১৮
= ।০	= ।।০	= ।০
= ১,৫৩,০০০/-	= ৩,০৬,০০০/-	= ১,৫৩,০০০/-
মৃত		

টাকা = ১,৫৩,০০০/- আরিফ সাহেব তাছহীহ ১৮

মৃত

মাফিল ইয়াদ ১ মূল সংখ্যা-৬

খোদেজা বেগম (মাতা)	সিদ্দিক (পুত্র)	ফাতেমা (কন্যা)	খালেদ সাহেব (ভাই)
$\frac{১}{৩}$	১০	৫	বঞ্চিত
= ৯৩৷/	= ৪৪৷//৯	= ২২//২	
= ২৫,৫০০/-	= ৮৫,০০০/-	= ৪২,৫০০/-	

ফরিদা পারভীন এর স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি হতে তার কাফন, দাফন, ঋণ ও অছিয়ত আদায় করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ইসলামী শরীয়া তথা ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তার নিম্নলিখিত ওয়ারিশগণের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে বন্টন করা হবে।

খোদেজা বেগম	$\frac{৩}{৭২}$ ভাগ	= ৯৬৷/	= টাকা = ২৫,৫০০/-
সিদ্দিক	$\frac{৪৬}{৭২}$ ভাগ	= ॥৪৪৷//৯	= টাকা = ৩,৯১,০০০/-
ফাতেমা	$\frac{২৩}{৭২}$ ভাগ	= ।২২//২	= টাকা = ১,৯৫,৫০০/-
মোট	১	= ৯১	= টাকা = ৬,১২,০০০/-

বিঃদ্রঃ যেহেতু আরিফ সাহেব মৃত্যুকালে তার পুত্র সিদ্দিককে রেখে যান সেহেতু ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে খালেদ সাহেব তার ভাই আরিফ সাহেবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবেন না।

গর্ভস্থিত সন্তানের অংশ

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে গর্ভধারণের সর্বাধিক কাল ২ বৎসর এবং সর্বনিম্নকাল ৬ মাস। এ হিসেবে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী ২ বৎসর সময়ের মধ্যে যদি গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে মনে করতে হবে, এ সন্তান মৃত ব্যক্তিরই এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। ২ বৎসর পার হয়ে যাবার পর সন্তান ভূমিষ্ট হলে এ সন্তান মৃত ব্যক্তির নয় এবং মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীও হবে না। অপরদিকে কোন ব্যক্তি বিবাহের পর স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে মৃত্যুবরণ করলে বিবাহের তারিখ থেকে ৬ মাস পূর্ণ হবার পূর্বেই যদি সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এ সন্তান মৃত ব্যক্তির নয় বরং বিবাহের পূর্বেই স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল। এ সন্তান মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে মারা যায় তাহলে গর্ভস্থিত সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা উত্তম। সন্তান ভূমিষ্ট হবার পূর্বেই যদি সম্পত্তি বন্টন করা হয় তাহলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– গর্ভস্থিত সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে, একজন নাকি একাধিক, জীবিত নাকি মৃত এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সম্পত্তি বন্টন করা হয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণই বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওয়ারিশগণ যদি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাহলে গর্ভস্থিত সন্তানকে এক ছেলে মনে করে তার অংশ রেখে দিয়ে সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। এটাই হানাফী মাজহাবের আইনবিদগণের মত এবং এর উপরই ফতোয়া। ছেলে জীবিত থাকলে যারা যতটুকু অংশ পায়, ততটুকুই পাবে এবং যারা বঞ্চিত হয় তারা বঞ্চিতই হবে। পরবর্তীতে যদি এক ছেলেই ভূমিষ্ট হয় তাহলে বন্টন নীতি বহাল থাকবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে মেয়ের অংশ রেখে অবশিষ্ট সম্পত্তি অথবা মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি গর্ভস্থিত সন্তানকে ছেলে মনে করায় যারা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বঞ্চিত হয়েছিল তাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। আর যদি সন্তান একাধিক ছেলে বা মেয়ে ভূমিষ্ট হয় তাহলে বন্টনকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে পুনরায় ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। সুতরাং গর্ভস্থিত সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা শ্রেয়।

নপুংসক ব্যক্তির অংশ

যাকে পুরুষ বা নারী কোনটিই স্থির করা যায় না অর্থাৎ যার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় প্রকারের লক্ষণই বিদ্যমান তাকে খুনছা বা হিজরা বা নপুংসক বলে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং অধিকাংশ সাহাবীর মতে প্রত্যেক খুনছা অর্থাৎ নপুংসক ব্যক্তি এক মেয়ের সমপরিমাণ অংশ পাবে।

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অংশ

নিরুদ্দেশ ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে জীবিত এবং অন্যের সম্পত্তির মধ্যে মৃত। অর্থাৎ কেউ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং সেও অন্যের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সঠিক খবর না পাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব সম্পত্তি বন্টন করা যাবে না এবং নিরুদ্দেশ ব্যক্তি যে যে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে সে সকল সম্পত্তিও বন্টন করা হতে বিরত থাকতে হবে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির খোঁজ পাবার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মেয়াদ নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। হানাফী মাজহাবের আইনবিদগণের মতে ৯০ বৎসর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং এর উপরই ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্মের তারিখ হতে ৯০ বৎসর পর তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা হবে। সুতরাং ২০ বছর বয়সে যদি কেউ নিরুদ্দেশ হয় তাহলে পরবর্তী ৭০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যারা মারা যাবে তারা নিরুদ্দেশ ব্যক্তি, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। ৯০ বৎসর মেয়াদকাল অতিবাহিত হবার পর নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন করা যাবে। তবে সম্পত্তি বন্টন করার পর যদি সে জীবিতাবস্থায় উপস্থিত হয় তাহলে তার যে সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল তা যথাযথ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সেও যে সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী ছিল তা বন্টন হয়ে থাকলে সে সকল বন্টনকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে পুনরায় বন্টন করে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে তার ন্যায্য অংশ প্রদান করতে হবে।

জারজ সন্তানের অংশ

যিনা অর্থাৎ ব্যভিচার করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে এবং যিনাকারী ও যিনাকারিণীর কঠোর শাস্তির বিধানও পবিত্র কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যিনার মাধ্যমে যে সন্তান (জারজ সন্তান) জন্মলাভ করে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে তার অধিকারকেও খর্ব করা হয়নি। জারজ সন্তান যেহেতু পিতৃপরিচয় লাভ করতে পারে না, সেহেতু জারজ সন্তান ছেলে হউক বা মেয়ে হউক, পূর্ব বর্ণিত হারে তারা নিজ মাতা ও তাদের আত্মীয়গণের ওয়ারিশ হবে।

দুর্ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারীদের অংশ

নিকটাত্মীয় এবং পরস্পরের উত্তরাধিকারী এমন একাধিক ব্যক্তি যদি একই দুর্ঘটনায় (যেমন আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, বাস-ট্রাক দুর্ঘটনা ইত্যাদি) এক সাথে মারা যায় এবং কে কার পূর্বে মারা গিয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। মৃত ব্যক্তিগণ একই সাথে এবং একই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করেছে বলে গণ্য হবে এবং মৃত ব্যক্তিগণ পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে না।

কয়েদীর অংশ

যদি কোন মুসলমান অমুসলিম দেশের কারাগারে (কয়েদখানায়) বন্দী থাকে, তাহলে তার ফিরে না আসা পর্যন্ত এজমালি সম্পত্তিতে তার নির্ধারিত অংশ আলাদা করে রাখতে হবে। এছাড়া সে নিজের অর্জিত যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল তাও তার ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কয়েদী পুরুষ হউক বা নারী। সে যদি জীবিত ফিরে না আসে তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে তার প্রাপ্য অংশ এবং নিজের অর্জিত সমুদয় সম্পত্তি তার ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) গণের মধ্যে বন্টন করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থা

মুরতাদের অংশ

কোন মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাকে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী বলা হয়। মুরতাদের দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড এবং পরকালে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। তারা চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

মুরতাদ তার মুসলমান আত্মীয়গণের ওয়ারিশ হবে না এবং মুসলমান থাকাবস্থায় সে যে সম্পদ অর্জন করেছিল তা তার মুসলমান ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর মুরতাদ অবস্থায় সে যে সম্পদ অর্জন করেছিল তা 'বায়তুল মাল'-এ জমা করা হবে।

যাবিল আরহামগণের বর্ণনা

যে সকল ব্যক্তিগণ যাবিল ফুরুজ কিংবা আসাবাদের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদেরকে যাবিল আরহাম বলা হয়। যাবিল ফুরুজ কিংবা আসাবাদের কেউ জীবিত না থাকলে যাবিল আরহামগণ উত্তরাধিকারী হবে। উল্লেখ্য যে, যাবিল ফুরুজ কিংবা আসাবাগণের বর্তমানে যাবিল আরহামগণ কেউ কোন অংশ পাবে না।

যাবিল আরহাম ৪ প্রকার। যথা–

১। মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং পৌত্রীর সন্তানগণ। যেমন– দৌহিত্র, দৌহিত্রী ইত্যাদি।

২। মৃত ব্যক্তি যাদের সন্তানের সন্তান। যেমন– নানা, নানী ইত্যাদি।

৩। মৃত ব্যক্তির ভাই ও বোনদের সন্তান। যেমন– ভাতিজী, ভাগিনী, ভাগিনা ইত্যাদি।

৪। মৃত ব্যক্তির দাদা বা নানার সন্তানগণ। যেমন– ফুফু, খালা, মামা ইত্যাদি।

যাবিল আরহামের ক্ষেত্রেও আসাবাদের নীতিই অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী কেউ জীবিত থাকলে দূরবর্তী কেউ কোন অংশ পাবে না।

হিন্দু আইন

হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কে বা কারা এবং হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি কখন হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য ইতিহাস বা হিন্দুশাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত সঠিক কোন তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হননি। হিন্দু শব্দটি হিন্দু শাস্ত্রেও উল্লেখ নেই। ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া মহাদেশ হতে একদল লোক ভারতবর্ষে এসে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদের উপকূলে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদেরকে আর্যজাতি বলে পরিচয় দেয়। সিন্ধু নদকে আর্যরা পবিত্র নদ বলে মনে করত। সিন্ধু শব্দ থেকেই সিন্ধু নদের উপকূল বাসীরা হিন্দু নামে পরিচিত। আইন বিজ্ঞানীদের মতে হিন্দু আইন হচ্ছে হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন। হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হলঃ বেদ, স্মৃতি ও প্রথা। প্রথা অর্থাৎ যে সকল রীতি নীতি হিন্দু পরিবার অথবা কোন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত ছিল, সেগুলো হিন্দু আইনে পরিণত হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিলে কালেক্টর মাদুরা বনাম মন্টুরাম মামলায় মহামান্য বিচারক বলেছিলেন–

"Clear proff of usage will outweight the written text of Hindu Law."

অর্থাৎ প্রথা নিঃসন্দেহে হিন্দু আইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়নে বা পরিবর্তনে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি আইন চালু রয়েছে। যথা–

১) দায়ভাগ পদ্ধতি এবং ২) মিতাক্ষরা পদ্ধতি।

নিম্নে অতি সংক্ষিপ্তভাবে দায়ভাগ আইন ও মিতাক্ষরা আইনের পরিচয় তুলে ধরা হলঃ

দায়ভাগ পদ্ধতি

এ আইন জীমুতবাহন কর্তৃক রচিত। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বংগ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে পিন্ডদান শর্ত। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান মতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এ শর্তে উত্তরাধিকার লাভ করবে যে, সে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে তার আত্মিক কল্যাণ কামনা করবে এবং মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে যারা শাস্ত্র মতে পিন্ডদানের অধিকারী তারাই কেবল উত্তরাধিকারী হবে। দায়ভাগ আইন উত্তরজীবী সূত্র স্বীকার করে না। তাই এ আইনে পিতা, পুত্র ও পৌত্র একই সংগে উত্তরাধিকারী হতে পারে না।

দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা- ১) সপিন্ড, ২) সাকুল্য ও ৩) সমানোদক।

প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ সপিন্ডের কেউ যদি জীবিত থাকে তাহলে সাকুল্য ও সমানোদকগণ কোন অংশ পাবে না। সপিন্ডের কেউ জীবিত না থাকলে সাকুল্য এবং সাকুল্যের অবর্তমানে সমানোদকগণ উত্তরাধিকারী হবে।

যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার শ্রাদ্ধে পিন্ডদান করে এবং মৃত ব্যক্তির জীবিতকালে যে সকল ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করতে বাধ্য, তারা সকলেই পরস্পরের সপিন্ড। সপিন্ডগণ সকলেই মৃত ব্যক্তির সগোত্র নয়, ভিন্ন গোত্রের আত্মীয়ও হতে পারে। যেমন- দৌহিত্র। দায়ভাগ আইনে সপিন্ডের সংখ্যা মোট ৫৩ জন।

নিম্নে শুধুমাত্র সপিন্ডগণের তালিকা পেশ করা হলঃ

১। পুত্রের তরফ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা- পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং কন্যার তরফ হতে অধঃস্তন তিন পুরুষ যথা- কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র। ৬ জন

২। পিতার তরফ হতে উর্ধতন তিন পুরুষ, যথা- পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতার তরফের তিন পুরুষ, যথা- মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা এবং মাতার পিতার পিতার পিতা। ৬ জন

৩। ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভ্রাতার পুত্রের পুত্র, খুড়া, খুড়ার পুত্র, খুড়ার পুত্রের পুত্র, পিতার খুড়া, পিতার খুড়ার পুত্র, পিতার খুড়ার পুত্রের পুত্র, ভগ্নির পুত্র, পিতার ভগ্নির পুত্র, পিতামহের ভগ্নির পুত্র, ভ্রাতার কন্যার পুত্র, ভ্রাতার পুত্রের কন্যার পুত্র, খুড়ার কন্যার পুত্র, পিতার খুড়ার কন্যার পুত্র, খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, পিতার খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, মামা, মামার পুত্র, মামার পুত্রের পুত্র, মাতার খুড়া, মাতার খুড়ার পুত্র, মাতার খুড়ার পৌত্র, মাতার খুড়ার পিতামহ, মাতার খুড়ার পিতামহের পুত্র, মাতার খুড়ার পিতামহের পৌত্র, মাসীর পুত্র, মাসীর পৌত্র, মাসীর প্রপৌত্র, মামার কন্যার পুত্র, মামার পুত্রের কন্যার পুত্র, মাতার খুড়ার কন্যার পুত্র, মাতার খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, মাতার খুড়ার পিতামহের কন্যার পুত্র এবং মাতার খুড়ার পিতামহের পুত্রের কন্যার পুত্র। ৩৬ জন

৪। মহিলা যথা- বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার পিতার মাতা। ৫ জন

মোট = ৫৩ জন

সপিন্ডের উপরোক্ত কেউ জীবিত থাকলে সাকুল্য ও সমানোদক শ্রেণীর কেউ উত্তরাধিকারী হবে না। যেহেতু সপিন্ডের উপরোক্ত ৫৩ জনের মধ্যে কোন একজন বর্তমান থাকা অস্বাভাবিক নয়, সেহেতু সাকুল্য ও সমানোদক শ্রেণীর উত্তরাধিকারী স্বত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। তাই সাকুল্য ও সমানোদক শ্রেণীর আলোচনা করা পরিহার করা হল। হিন্দু আইনের উত্তরাধিকার তালিকায় ক্রম অনুসারে উত্তরাধিকারীত্ব পায়। সপিন্ডের বর্ণনা থেকেই পাঠক পাঠিকাগণ হয়তো অনুধাবন করতে পারছেন যে, হিন্দু আইনে নারী সমাজকে কত পিছনে ঠেলে দেয়া হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অংশ পাবার স্বপ্নও হয়তো দেখতে পারবে না নারী জাতি।

মিতাক্ষরা পদ্ধতি

মিতাক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকার ঋষি যাজ্ঞবল্কের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলিত নিবন্ধ। এ পদ্ধতি একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবংগ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরজীবী সূত্রে অংশীদার হয়। তাই এ আইনে পিতা, পুত্র ও পৌত্র একই সংগে উত্তরাধিকারী হতে পারে। এ পদ্ধতিতে পিতা বর্তমান থাকা অবস্থায়ই পুত্র সম্পত্তির ভাগ বন্টন দাবী করতে পারে। মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণিত হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা– ১) গোত্রজ সপিন্ড, ২) সমানোদক ও ৩) বন্ধু।

গোত্রজ সপিন্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭ জন। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের তালিকা দেয়া হলঃ

১। পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধঃস্তন পুরুষ	– ৬ জন
২। পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধতন পুরুষ	– ৬ জন
৩। উপরোক্ত ৬টি উর্ধতন পুরুষের পত্নীগণ	– ৬ জন
৪। উপরোক্ত ৬টি উর্ধতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশ ধারায় ৬টি অধঃস্তন পুরুষ	৩৬ জন
৫। বিধবা, কন্যা ও কন্যার পুত্র	– ৩ জন

	মোট = ৫৭ জন

উল্লেখ্য যে, গোত্রজ সপিন্ডের কেউ জীবিত থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে না। গোত্র সপিন্ডের কেউ জীবিত না থাকলে সমানোদক শ্রেণী উত্তরাধিকারী হবে এবং সমানোদক শ্রেণীর কেউ জীবিত না থাকলে বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে। গোত্রজ সপিন্ডের যে কেউ জীবিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর লোকের উত্তরাধিকারী হবার সম্ভাবনা নেই বললেও হয়তো ভুল হবে না। এমতাবস্থায় ২য় ও ৩য় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। মিতাক্ষরা আইনেও উত্তরাধিকার তালিকায় ক্রম অনুসারে উত্তরাধিকারীত্ব পায়। ফলে এ আইনেও নারী জাতিকে যেভাবে অবহেলা করা

হয়েছে তা হয়তো বলার আর অপেক্ষা রাখে না। নারী মুক্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণের উদ্দেশ্যে আবারও দীপ্ত কণ্ঠে বলব, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন। ইসলামকে ভালভাবে জানার এবং বুঝার চেষ্টা করুন। উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ইসলামই দিয়েছে নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকার।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ একই সংগে অংশ প্রাপ্ত হয় না। একজন উত্তরাধিকারী জীবিত থাকাবস্থায় অপর উত্তরাধিকারী ওয়ারিশ হতে পারে না। দায়ভাগ আইনে পিন্ড মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরাধিকারী হবার জন্যে পিন্ড দান শর্ত। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ বা নিবেদন করাকে পিন্ড বলে। যারা মৃত ব্যক্তির সপিন্ড তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার তালিকায় ক্রম অনুসারে উত্তরাধিকারীত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন– মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে কন্যারা কোন অংশ পায় না। এছাড়া মিতাক্ষরা মতে কোন যৌথ পরিবারের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই সে পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরজীবী সূত্রে অংশীদার হয়। ফলে মিতাক্ষরা মতে পিতা, পুত্র ও পৌত্র একই সংগে অংশীদার হয় কিন্তু কন্যা সন্তান কোন অংশ পায় না। অপরদিকে দায়ভাগ মতে উত্তরজীবী সূত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বইটিতে হিন্দু আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে করুণ অবস্থা রয়েছে, তার কিছু চিত্র এ বইটিতে তুলে ধরব এবং এ সকল বিষয়ে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তার তুলনামূলক আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

হিন্দু আইনে নারীর অবস্থা

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর করুণ অবস্থার কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১। মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পায় না। মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যার কোন অংশ না পাবার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ না কেউ জীবিত থাকতেই পারে।

২। এমনিভাবে দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী হবে না। কন্যাকে যদিও সপিন্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এমন অবস্থানে রাখা হয়েছে যে, তাদের অংশ পাবার তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই।

৩। দায়ভাগ আইনে কন্যা অ-তী হলে মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৪। দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিশগণ জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পায় না। অন্যান্য ওয়ারিশগণের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হবার অধিকারিণী হলেও, যে সকল কন্যা/কন্যাগণ বন্ধ্যা কিংবা শুধুমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না।

৫। মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীগণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সন্তান তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না। এছাড়া যে সকল কন্যাগণ পুত্র জন্ম দিতে সক্ষম নয়, যে বন্ধ্যা, যে শুধু কন্যাবতী সে মৃত পিতার ওয়ারিশ হতে পারে না। যে সকল কন্যারা পিতার ওয়ারিশ হতে পারে তাদের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যার দাবী প্রথম, এরপর বিবাহিতা বিত্তহীন এবং শেষে বিবাহিতা বিত্তশালী।

৬। পূর্বে হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবা কোন অংশ পেত না। ১৯৩৭ সালে সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত (১৯৩৭ সালের ১৮ নং আইন) পাশ হবার পর মৃতের বিধবা, পুত্রের বিধবা এবং পৌত্রের বিধবা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সাথে উত্তরাধিকার পায়। উক্ত আইনটি ১৪-৪-১৯৩৭ ইং হতে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষি জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

৭। স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী অসতী হলে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ উভয় আইনে সে তার মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে।

৮। বিধবা হবার পর যদি স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করে তবে সে তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

৯। দায়ভাগ আইনে যে কোন হিন্দু ব্যক্তি শুধুমাত্র বিধবা রেখে মারা গেলে এবং অন্য কোন উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকলে, বিধবাই উত্তরাধিকারীণী হিসেবে সম্পত্তি পাবে। কিন্তু বিধবা একজন মহিলা বিধায় তিনি ঐ সম্পত্তি নিরংকুশভাবে পাবেন না। তিনি শুধু ঐ সম্পত্তির আয় ভোগ করার অধিকারিণী। ঐ সম্পত্তি দান কিংবা বিক্রি করার অধিকার তার নেই। তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তার নিকটবর্তী কোন উত্তরাধিকারী পাবে না বরং স্বামীর নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী পাবে।

১০। হিন্দু আইনে পৌত্রী এবং বোন কোন অবস্থাতেই অংশ পায় না।

১১। মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকার পায় না। এছাড়া দায়ভাগ আইনে পিতা জীবিত থাকলে অথবা মাতা অসতী হলেও মাতা মৃত পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়।

১২। কন্যা, মাতা, বিধবা স্ত্রী, পিতামহী প্রভৃতি হিন্দু মহিলাগণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র জীবিতকাল ভোগ দখলের অধিকারিণী হয়। হিন্দু নারীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পায়, তা সীমিত অর্থাৎ জীবন সত্বে পায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তারা স্বীয় ইচ্ছামত কোন প্রকার দান, উইল, বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারে না। এ সকল মহিলাগণের মৃত্যুর পর, তারা যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটবর্তী ভাবী উত্তরাধিকারীগণ উপরোক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে।

১৩। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পুরুষত্বহীন ব্যক্তি, বর্ণভ্রষ্ঠ ব্যক্তি, জন্মান্ধ, বধির, পাগল মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পাদনে অযোগ্য বিধায় ওয়ারিশত্ব লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে। এ ব্যাপারে মহামুনি মুন বলেন,

"অনংশৌ ক্লীব পতিজাত্যন্ধবধিরৌ তথা
উন্মত্ত জড়মুকাশ্চ যে চ কেচিন নিরিন্দিয়া।"

এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার যে, হিন্দু আইনে নারী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সাধারণত কোন অংশ পায় না। যে অবস্থায় কেবলমাত্র ভোগ দখলের

জন্যে কন্যার ভাগ্যে সামান্য সম্পত্তি জুটে থাকে, সে অবস্থায়ও উপরোক্ত বাধাগুলোর কারণে বঞ্চিত হয়ে যায়। হিন্দু আইনে এ সকল নারীদের ভাগ্যের কি পরিহাস তা সহজেই অনুমেয়।

১৪। হিন্দু আইনে কোন বিবাহিতা হিন্দু মহিলা শুল্ক স্ত্রী ধন রেখে মারা গেলে, তার বৈপিত্রেয়া ভাই, পিতা, পিতার সপিন্ড ও অন্যান্য ওয়ারিশগণ পরিত্যক্ত শুল্ক স্ত্রী ধনের উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু তার কন্যা, বোন পুত্র অংশ পায় না। শুল্ক বিহীন স্ত্রী ধন রেখে গেলেও মা, বোন পুত্র বঞ্চিত হয়।

১৫। মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ আইনে মাত্র ৫ জন মহিলাকে সপিন্ড বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যথা– বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী। এছাড়া মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ আইনে যথাক্রমে ৫২ জন এবং ৪৮ জনই হল পুরুষ।

১৬। হিন্দু আইনে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী এরা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গণ্য। এরা জীবিত থাকলে অন্য কেউ মৃতের উত্তরাধিকারী হবে না। সুতরাং এরা জীবিত থাকলে কন্যা ও মাতা বঞ্চিত হবে, এছাড়া পৌত্রী এবং বোন তো সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত।

১৭। মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মিলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়। পিতা জীবিত থাকতেই পুত্র তার অংশ দাবী করতে পারে। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মিলে উত্তরাধিকারিণী হয় না এবং সে সম্পত্তিও দাবী করতে পারে না।

সে একজন নারী, এটাই তার অপরাধ। হিন্দু আইনে এ হল নারীর অধিকার।

উত্তরাধিকারিত্বে যাদের অগ্রাধিকার

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হিন্দু দায়ভাগ আইনে সপিন্ডের সংখ্যা ৫৩ জন এবং মিতাক্ষরা আইনে সপিন্ডের সংখ্যা ৫৭ জন। সপিন্ডের কেউ জীবিত থাকলে অন্য কেউ অর্থাৎ সাকুল্য ও সমানোদক শ্রেণীর কেউই উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এছাড়া সপিন্ডের মধ্যে ক্রম অনুসারে উত্তরাধিকারী হবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মাত্র ২২ জন সপিন্ড ওয়ারিশগণের তালিকা ক্রম অনুসারে নিম্নে পেশকরা হলঃ

১। পুত্র
২। পৌত্র
৩। প্রপৌত্র
৪। মৃতের বিধবা স্ত্রী
৫। মৃতের পুত্রের বিধবা স্ত্রী
৬। মৃতের পৌত্রের বিধবা স্ত্রী
৭। কন্যা
৮। দৌহিত্র
৯। পিতা
১০। মাতা
১১। ভ্রাতা
১২। ভ্রাতুষ্পুত্র
১৩। ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র
১৪। ভাগিনা (বোনের ছেলে)
১৫। পিতামহ
১৬। পিতামহী
১৭। খুড়া এবং জেঠা
১৮। তাদের পুত্র
১৯। তাদের পৌত্র
২০। পিসতুত ভ্রাতা
২১। প্রপিতামহ
২২। প্রপিতামহী।

কোন হিন্দু ব্যক্তি মারা গেলে উপরোল্লিখিত ২২ জন সপিন্ডের মধ্যে কোন একজন জীবিত থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই বাকি সপিন্ড কিংবা সপিন্ডের পরবর্তীদের নাম উল্লেখ করার আর প্রয়োজন পড়ে না। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ১ নং থেকে ৩ নং অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র একই সাথে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের মতবাদ প্রচলিত। এ তিন জনের কোন একজন জীবিত থাকলে হিন্দু আইনে ক্রমিক নং ৪ অর্থাৎ বিধবা পূর্বে কোন অংশ পেত না। কিন্তু ১৯৩৭ সালে আইনের মাধ্যমে বিধবাকে একই সাথে উত্তরাধিকারিণী করা হয়েছে। অর্থাৎ ১ নং থেকে ৬ নং পর্যন্ত বর্তমানে সবাই একই সাথে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে। ৬ নং পর্যন্ত কেউ যদি জীবিত না থাকে তাহলে ৭ নং অর্থাৎ কন্যা উত্তরাধিকারিণী হবে এবং পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যার সবাই বঞ্চিত হবে। ৭ নং অর্থাৎ কন্যা যদি জীবিত না থাকে, তাহলে ৮ নং অর্থাৎ দৌহিত্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। ৮ নং যদি জীবিত না থাকে তাহলে ৯ নং অর্থাৎ পিতা উত্তরাধিকারী হবে এবং পরবর্তী সবাই বঞ্চিত হবে। এভাবে ক্রম অনুসারে চলবে। যেহেতু হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে সবাই একই সংগে উত্তরাধিকারী হতে পারে না এবং কোন ক্রমিক সংখ্যার লোকজন জীবিত থাকলে তারাই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে যায়, পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যার লোকজন **উত্তর**াধিকারী হতে পারে না, এমতাবস্থায় হিন্দু আইনে নারীদের অংশ পাবার সম্ভাবনা কতটুকু তা পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু আইনে নারীর অবস্থা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হল।

১। শ্রীকান্ত পুত্র, স্ত্রী এবং কন্যা রেখে মারা গেল।

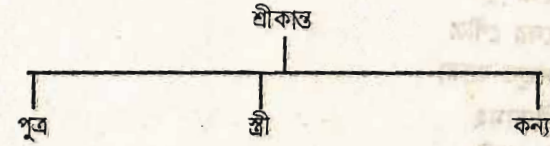

এমতাবস্থায়,

পুত্র পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ,

স্ত্রী পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং

কন্যা বঞ্চিত হবে।

(১৯৩৭ সালের আইন পাশ হবার পূর্বে পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত। স্ত্রী কোন অংশ পেত না)।

২। রমেশ ভাই, বোন এবং পৌত্র রেখে মারা গেল।

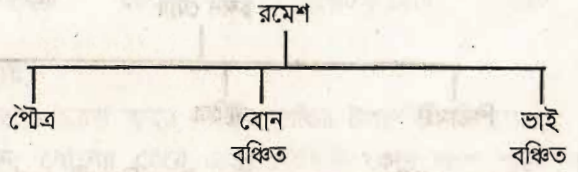

এমতাবস্থায়,

পৌত্রই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

ভাই এবং বোন কোন অংশ পাবে না।

৩। নিতাই পুত্র, বোন এবং মাতা রেখে মারা গেল।

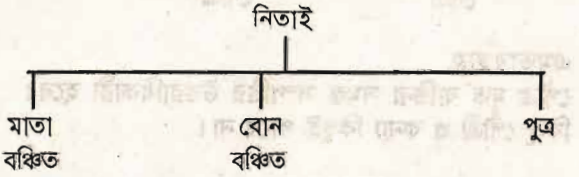

এমতাবস্থায়,

পুত্র সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

মাতা ও বোন কোন অংশ পাবে না।

৪। দেবেন্দ্র নাথ মাতা, বোন, কন্যা এবং পৌত্র রেখে মারা গেল।

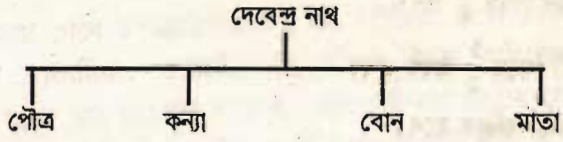

এমতাবস্থায়,
পৌত্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।
কিন্তু কন্যা, বোন ও মাতা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে।

৫। চন্দন ঘোষ মাতা, দৌহিত্র এবং পিতামহী রেখে মারা গেল।

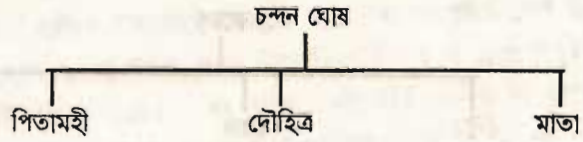

এমতাবস্থায় দৌহিত্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।
কিন্তু মাতা ও পিতামহী কোন অংশ পাবে না।

৬। নরেন্দ্র বাবু পৌত্র, পৌত্রী ও কন্যা রেখে মারা গেল।

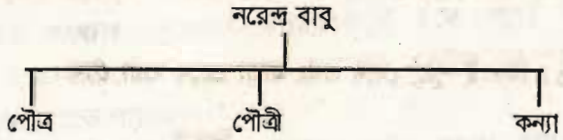

এমতাবস্থায়,
পৌত্র মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।
কিন্তু পৌত্রী ও কন্যা কিছুই পাবে না।

৭। রামেন্দ্র বাবু পিতা, পিতামহী, পৌত্রী রেখে মারা গেল।

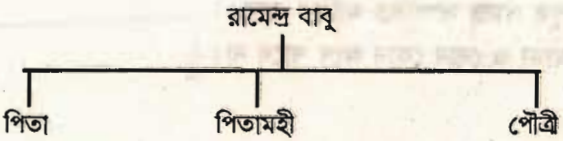

এমতাবস্থায়,
পিতা মৃত পুত্রের সমস্ত সম্পত্তি পাবে।
পৌত্রী এবং পিতামহী বঞ্চিত হবে।

৮। নরেন্দ্র বাবু বোন, বোনের ছেলে, বোনের মেয়ে এবং দৌহিত্রী রেখে মারা গেল।

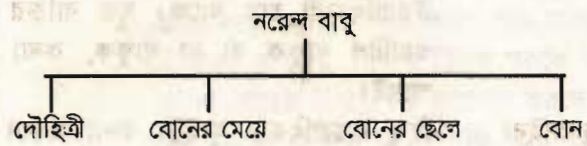

এমতাবস্থায়,
বোনের ছেলে নরেন্দ্র বাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

কিন্তু বোন, বোনের মেয়ে এবং দৌহিত্রী কোন অংশ পাবে না। বোন ভাগিনার (বোনের ছেলে) তুলনায় নিকটবর্তী। অথচ বোন নারী হবার কারণে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী পৌত্রী এবং দাদীকে নারী হিসেবে কত অবহেলা করা হয়েছে। অপর দিকে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কোন নারীকেই বঞ্চিত করা হয়নি। পুত্রের সাথেও মা, স্ত্রী ও কন্যাকে উত্তরাধিকারিণী করা হয়েছে।

ইসলাম ও হিন্দু আইনে নারীর তুলনা

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে অধিকার দেয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে হিন্দু আইনে নারীর যে করুণ অবস্থা, তা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

১। **ইসলামী আইনঃ** ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিশ থাকুক বা না থাকুক, কন্যা তার অংশ পাবেই।

হিন্দু আইনঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হতে পারে না। মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত ৬ জনের কেউ জীবিত না থাকলে কন্যা উত্তরাধিকারী হবে।

২। **ইসলামী আইনঃ** মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা পুত্র জীবিত থাকলেও কন্যা উত্তরাধিকারিণী হয়ে থাকে। পিতা জীবিত থাকলে কন্যা পায় $\frac{১}{২}$ অংশ আর পুত্র জীবিত থাকলে কন্যা পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে থাকে।

হিন্দু আইনঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান কোন অংশ পাবে না।

৩। **ইসলামী আইনঃ** মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা করা শর্ত নয়। অর্থাৎ কোন উত্তরাধিকারী যদি মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক শান্তির জন্যে দোয়া নাও করে তথাপি ওয়ারিশী স্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করা ওয়ারিশগণের কর্তব্য।

হিন্দু আইনঃ দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে পিন্ডদান করা শর্ত। যারা শাস্ত্র অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার পার্বনা শ্রাদ্ধে পিন্ডদান করবে এবং পিন্ডদানের অধিকারী তারাই সপিন্ড। সপিন্ডই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী।

৪। ইসলামী আইনঃ মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পেয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ত্বে লাভ করে। অর্থাৎ কন্যা তার প্রাপ্য অংশ স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবহার, দান ও বিক্রয় করতে পারবে। তার এ অধিকারের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কন্যার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি তার অর্থাৎ কন্যার উত্তরাধিকারীগণ পাবে।

হিন্দু আইনঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পায় তা কেবলমাত্র জীবন স্বত্ত্বে লাভ করে। কন্যার প্রাপ্য অংশের উপর তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ কন্যা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কেবলমাত্র ভোগ দখল করবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অংশ কন্যা স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবহার, দান, বিক্রয়, উইল কিংবা সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। কন্যার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি কন্যার কোন উত্তরাধিকারীও পাবে না, বরং যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটাত্মীয়দের নিকট সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫। ইসলামী আইনঃ কন্যা যদি চরিত্রহীনা এবং অসতীও হয়, তথাপি কন্যা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। অসতীর কারণে কেউ তাকে তার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত করতে পারবে না। অবশ্য চরিত্রহীনা এবং অসতীর কারণে সে গুণাহগার হবে। কিন্তু উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইনঃ দায়ভাগ আইনে অসতীত্বের কারণে কন্যা সন্তান মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীত্ব হতে বঞ্চিত হবে।

৬। ইসলামী আইনঃ সকল কন্যার সমান অধিকার। কন্যা সন্তান অবিবাহিতা হউক কিংবা বিবাহিতা, পুত্র সন্তানের মা হউক কিংবা কন্যা সন্তানের মা হউক, অথবা বন্ধ্যা হউক ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সকল কন্যারই সমান অধিকার। অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যাই মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সমান হারে অংশ পাবে।

হিন্দু আইনঃ হিন্দু আইনে সকল কন্যার সমান অধিকার নেই। বন্ধ্যা কিংবা যে কন্যা কেবলমাত্র কন্যা সন্তানের মা হয়েছে, সে মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না। হিন্দু আইনে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। অতপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যাদের দাবী। কুমারী কন্যা জীবিত থাকলে বিবাহিতা কন্যারা বঞ্চিত হবে। যে কন্যা কেবলমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে বা বন্ধ্যা সেও বঞ্চিত হবে।

৭। ইসলামী আইনঃ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকলেও কন্যা তার নির্ধারিত অংশ পাবে। যেহেতু কন্যা যাবিল ফুরুজ, সেহেতু সকল অবস্থায়ই কন্যা উত্তরাধিকারিণী হবে। কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইনঃ মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা তার মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না।

৮। ইসলামী আইনঃ কন্যা যদি অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ হয়, তথাপি সে উত্তরাধিকারীত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। তার নির্ধারিত অংশ সে পাবেই।

হিন্দু আইনঃ কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ হলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৯। ইসলামী আইনঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সহোদর বোন, বৈপিত্রেয়া বোন, বৈমাত্রেয়া বোন সকলেই উত্তরাধিকারিণী। তারা যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ বোনদের জন্যে অংশ নির্ধারিত আছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থা

হিন্দু আইনঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কোন প্রকার বোনই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণী নয়। অর্থাৎ বোনগণ বঞ্চিত হবে।

১০। ইসলামী আইনঃ নারী হিসেবে পৌত্রীও উত্তরাধিকারিণী। যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জন্যেও অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

হিন্দু আইনঃ পৌত্রীগণ উত্তরাধিকারিণী নয়।

১১। ইসলামী আইনঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সকল অবস্থায়ই স্ত্রী মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিশ জীবিত থাকুক আর নাই থাকুক, কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইনঃ পূর্বে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবাগণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারত না।

১৯৩৭ সালে বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ হবার পর বর্তমানে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সাথে বিধবা উত্তরাধিকারিণী হতে পারে।

১২। ইসলামী আইনঃ স্ত্রী যদি অসতী হয়, তথাপি স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। অবশ্য স্ত্রী অসতী হলে গুণাহগার হবে এবং এর শাস্তির বিধানও ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হওয়া থেকে কোন অবস্থায়ই বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইনঃ স্ত্রী অসতী হলে মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হতে বঞ্চিত হবে।

১৩। ইসলামী আইনঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ইসলাম নারীকে সে স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত হবে না। তার প্রাপ্য সে পাবেই।

হিন্দু আইনঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহলে সে পূর্ব মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে এবং ধরে নেয়া হবে যে, সেই হিন্দু মহিলা তার মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে আর বেঁচে নেই বরং মৃত্যু হয়েছে ((1923) 50 Cal 527)।

১৪। ইসলামী আইনঃ মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী যে অংশ পায়, তা সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ত্বে লাভ করে। অর্থাৎ এ সম্পত্তি স্ত্রী স্বীয় ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে দান, উইল এবং বিক্রয় করতে পারবে। এতে কারোর বাঁধা দেবার অধিকার নেই।

হিন্দু আইনঃ মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী যে অংশটুকু পায়, তা কেবলমাত্র জীবন স্বত্ত্বে লাভ করে। এ সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর পরিপূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়না। তিনি কেবলমাত্র ভোগ দখলকারিণী। তিনি এ সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না। অর্থাৎ এ সম্পত্তি তিনি স্বীয় ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে দান, উইল ও বিক্রয়, করতে পারবেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি স্ত্রীর উত্তরাধিকারীগণ পাবে না বরং যার নিকট থেকে সম্পত্তি লাভ করেছিল তার নিকটবর্তী আত্মীয়দের নিকট সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৫। ইসলামী আইনঃ মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ মৃত সন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারিণী হবে। যাবিল ফুরুজ হিসেবে মাতার অংশ নির্ধারিত আছে। কোন অবস্থাতেই মাতা বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইনঃ হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, কন্যা এবং পিতা জীবিত থাকলে মাতা কোন অংশ পায় না। এছাড়া মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্র সন্তান জীবিত থাকলেও মাতা উত্তরাধিকারিণী থেকে বঞ্চিত হয়।

১৬। ইসলামী আইনঃ মাতা যদি অসতী হয়, তাহলে মাতা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইনঃ দায়ভাগ আইনে মাতা যদি অসতী হয়, তাহলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

১৭। ইসলামী আইনঃ মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতা যে অংশ পায়, তার উপর মাতার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিতহয়। অর্থাৎ মাতা তার প্রাপ্য সম্পত্তি স্বীয় ইচ্ছামত ব্যয়, দান, উইল ও বিক্রয় করতে পারবে মাতার মৃত্যুর পর তার এ সম্পত্তি মাতার উত্তরাধিকারীগণ পাবে।

হিন্দু আইনঃ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মাতা মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে যে অংশ পায় তার উপর মাতার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মাতা এ সম্পত্তি কেবলমাত্র জীবন স্বত্ত্বে ভোগ দখল পায়। অর্থাৎ মাতা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন মাতা এ সম্পত্তি কেবলমাত্র ভোগ করতে পারবে। এ সম্পত্তির কোন ক্ষতি অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছামত ব্যয়, বিক্রি, দান বা উইল করতে পারবে না। মাতার মৃত্যুর পর মাতা যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটাত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৮। ইসলামী আইনঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মৃতের কন্যা এবং মাতা একই সাথে উত্তরাধিকারীণী হয়। কন্যা তার নির্ধারিত অংশ পাবে এবং মাতা, মাতার নির্ধারিত অংশ পাবে। একজনের কারণে অন্যজন বঞ্চিত হবে না। ইসলাম নারী হিসেবে মা ও কন্যা উভয়েরই অধিকার নিশ্চিত করেছে।

হিন্দু আইনঃ হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির কন্যা জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না। কারণ কন্যা হল ৭ নং ক্রমিকে আর মাতা হল ১০ নং ক্রমিকে। হিন্দু আইনে মাতার চেয়ে কন্যাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

১৯। ইসলামী আইনঃ পরিবারে কোন ব্যক্তির পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে না। বরং পিতার মৃত্যুর পর মৃত পিতার পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য ওয়ারিশগণ একই সাথে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্র কোন উত্তরাধিকার দাবী করতে পারে না।

হিন্দু আইনঃ মিতাক্ষরা আইনে যৌথ পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। ফলে পিতার জীবিতাবস্থায়ই পুত্র তার অংশ দাবী করতে পারে কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না।

২০। ইসলামী আইনঃ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে ১২ জন যাবিল ফুরুজের মধ্যে ৮ জনই হল নারী। যথা- স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন, বৈপিত্রেয়া বোন, বৈমাত্রেয়া বোন, মাতা ও দাদী। আর পুরুষ হল মাত্র ৪ জন। এদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকবে। এতে দেখা যাচ্ছে, নারীর সংখ্যাই পুরুষের তুলনায় বেশী। অর্থাৎ নারীর অধিকারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

হিন্দু আইনঃ মিতাক্ষরা আইনে ৫৭ জন স্বপিন্ডের মধ্যে মাত্র ৫ জন হল নারী, আর বাকী ৫২ জনই হল পুরুষ। দায়ভাগ আইনে ৫৩ জন সপিন্ডের মধ্যে মাত্র ৫ জন হল নারী। যথা- বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী। আর বাকি ৪৮ জনই হল পুরুষ। উপরন্ত ৫ জন নারীকে সপিন্ডের এমন অবস্থানেই রাখা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করা তাদের জন্যে দূর্লভ ব্যাপার।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম কোন অবস্থাতেই নারী জাতিকে অবহেলা করেনি কিংবা অংশ প্রাপ্যের দিক দিয়েও ঠকায়নি। হিন্দু উত্তরাধিখার আইনে নারীকে যেখানে অবহেলা করেছে এবং করুণ অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে ইসলাম নারী জাতিকে শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করেছে।উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন

বুদ্ধদেবের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধদের জন্যে পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে (১৯২৫ সালের ৩৯ নং আইন) শাসিত। ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত। হিন্দু সমাজে এলাকা এবং গোষ্ঠীভেদে যেমন বিভিন্ন প্রথা রয়েছে, তেমনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক শ্রেণীর আচার, বিচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সাথে অন্য শ্রেণীর কিছু কিছু গড়মিল রয়েছে। বাংলা ভারত উপমহাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রথা ব্যতীত ধর্মীয় মূলনীতিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

ডি, এফ মোল্লার Principal of Hindu Law এর Operation of Hindu Law এর অনুচ্ছেদে persons governed by Hindu Law তে বলা হয়েছে–

"Hindu Law applies (iv) to Jaina, Buddhists in India, Sikhs except so far as such law is veried by custom."

অর্থাৎ ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় অবশ্য তাদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত।

ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন কেসের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধিত আইনের ২ ধারার (১) উপধারায় বলা হয়েছেঃ

This act applis-

a) to any person...

b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion and

c) to any other person...

Explanation: The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case may be:

a) any child legimate or illigimate both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion;

b) any child legimate or illigimate, one of whose parents is a Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion and who is browght up as a member of the tribe, commrnity, group or family to which such parent belongs or belonged;

c) any person who is convert of reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.

উপরোক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের ১৯৫৬ সালের সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন যদিও বাংলাদেশে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে গৃহীত হয়নি, তথাপি বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ হিন্দু দায়ভাগ আইনের অধীনেই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের (আপীল বিভাগ) দেওয়ানী আপীল নং ৪০/১৯৮৪ (হাইকোর্ট বিভাগ, কুমিল্লা বেঞ্চের দ্বিতীয় আপীল নং ২১/১৯৮৩ এর ২০-৬-১৯৮৩ তারিখের রায় ও ডিগ্রীর বিরুদ্ধে) করতালা লক্ষী বিহার আপীলকারী বনাম হৃদয় রঞ্জন চৌধুরী গং, রেসপন্ডেট। অত্র মোকদ্দমায় বিজ্ঞ বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ও বিচারপতি এ,টি,এম আফজাল কর্তৃক সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ (Vide 40 DLR (AD) 1988)। সুপ্রীম কোর্টের আপীলের নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হলঃ

"Leave was granted to consider whether the Buddhists of Bangladesh are governed by the Hindu Law in matter of Succession.

Both the plainliffs and defendants accepted the proposition that the Buddhists of Bangladesh are governed by Dayabhage Hindu Law in matters of succession. The proposition laid down in 32 DLR 187 that "It cannot be said

that the Buddhists of our country are governed by Hindu law with regard to succession," is very sweeping.

বিজ্ঞ বিচারপতি লক্ষ্য করেছিলেন যে, 32 DLR 187 (হাইকোর্ট আপীল) ১৯৫৬ সালের ভারতীয় আইনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি। এ সংশোধিত আইন বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনে গৃহিত হয়নি। কিন্তু মামলার বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই সমর্থন করে যে, তাদের কেসে হিন্দু আইন গ্রহণযোগ্য। মামলার রায়ে বিজ্ঞ বিচারপতি উল্লেখ করেছিলেন যে, বর্তমান কেসে বাদী পরিতুষ্ট হয় যে, উত্তরাধিকার বিষয়ে দায়ভাগ হিন্দু আইনে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শাসিত। বিবাদী বিচারের সময়ে অথবা লিখিত জবাবে উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেনি। বিজ্ঞ বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন, বস্তুত উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে যে, চলতি কেসে উত্তরাধিকার হিন্দু আইনের দায়ভাগ আইনে শাসিত হবে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই তাদের অত্র কেসে হিন্দু আইন গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন।

উপরোক্ত বিষয়ে জজকোর্টে আপীল, দ্বিতীয় আপীল হাইকোর্ট বিভাগের কুমিল্লা বেঞ্চে এবং পরিশেষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আপীলের রায় ও ডিক্রি হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু দায়ভাগ আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত।

বৌদ্ধ আইনে নারীর অবস্থা

উপরোল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ও ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীদের কি করুণ অবস্থা তা হয়তো পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু ইতিপূর্বে হিন্দু উত্তরাদিকার আইনে হিন্দু নারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, কাজেই বৌদ্ধ নারীদের ক্ষেত্রেও হিন্দু নারীদের অবস্থাই বহাল থাকবে। কারণ বৌদ্ধরা হিন্দু আইনে শাসিত।

ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধগণ Burman Buddhist নামে পরিচিত। তারা স্থানীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত। তাদের উত্তরাধিকারীগণের ক্রম নিম্নরূপঃ

মূলধনী (মৃত ব্যক্তি)

১ম	পুত্র সন্তান
২য়	পৌত্র
৩য়	প্রপৌত্র
৪র্থ	দত্তক পুত্র
৫ম	সৎ মাতার পুত্র
৬ষ্ঠ	অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সৎপত্নীর সন্তান
৭ম	ভ্রাতা ও ভগ্নী
৮ম	পিতামাতা
৯ম	পিতার পিতামাতা
১০ম	দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় (distant kindred)
১০ (ক)	ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী
১০ (খ)	খুড়া ও খুড়ি
১০ (গ)	ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ
১০ (ঘ)	কাজিন (Causin)
১০ (ঙ)	ভ্রাতুষ্পুত্রের ও পুত্রীর পৌত্র ও পৌত্রীগণ

১০ (চ) কাজিনের সন্তানগণ

১০ (ছ) কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ

১০ (জ) কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণের যে তালিকা পেশ করা হল তাতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অধিকার রয়েছে। পুত্র থেকে শুরু করে কাজিনের প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবাই পুরুষ। বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণের তালিকায় প্রপৌত্র, সৎমাতার পুত্র এমনকি কাজিনের প্রপৌত্রের নাম উল্লেখ রয়েছে অথচ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা, বোন ও পৌত্রীর নাম উল্লেখ নেই। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, ঐ সব আইনে নারী জাতিকে চরমভাবে অবহেলা করা হয়েছে? নারীর অধিকার ও মর্যাদা বলতে কিছুই দেয়া হয়নি? কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার অসহায় বিধবা স্ত্রী, কন্যাদের একটু স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার জন্যে আর্থিক সুযোগ সুবিধাটুকু থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা হয়েছে?

পক্ষান্তরে ইসলাম মৃত ব্যক্তির কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মাতাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কোন অবস্থাতেই ইসলাম তাদেরকে ওয়ারিশত্ব থেকে বঞ্চিত করেনি। ইসলাম নারী জাতিকে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে যে অধিকার দিয়েছে, তার সামান্যতম অধিকার কী অন্য কোন ধর্ম বা মতাদর্শ দিতে পেরেছে? তথাকথিত নারী মুক্তিবাদীগণ ইসলামকে না জেনে এবং না বুঝে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং নারী হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় মত্ত। অধিকাংশ নারী ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে তারাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এ পুস্তকের মাধ্যমে আমি নারী সমাজকে আহবান করব, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে মানব রচিত কোন আইন তৈরীর দাবী নয়, বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে দাবী করুন। ইসলামই দিয়েছে নারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ অধিকার। ইসলামকে উপেক্ষা করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যত আইনই তৈরী হউক না কেন, এতে নারীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। অধিকার কেবলমাত্র আইন এবং বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং থাকবে। নারীর অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ নিশ্চিত করেছে একমাত্র ইসলাম। এখন প্রয়োজন কেবলমাত্র ইসলামের আইনগুলোর সঠিক প্রয়োগ।

খৃষ্টান আইনে নারীর অবস্থা

বাংলাদেশে বসবাসকারী খৃষ্টানগণ জন্মগত সূত্রে এবং খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত খৃষ্টান। খৃষ্টানগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- ১) ক্যাথলিক ও ২) প্রটেস্ট্যান্ট। আমাদের দেশে মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খৃষ্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (Act 39 of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খৃষ্টানগণের জন্যে উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য।

১৯২৫ সালের খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনের বিভিন্ন ধারাগুলো এ স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং নারীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য। তাই- বিভিন্ন ধারা থেকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হলঃ

১। যদি একজন হিন্দু খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে খৃষ্টান থাকে, তাহলে ২৯ ধারার সংজ্ঞায় সে হিন্দু নহে এবং তার ইনটেস্টেট সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সকল প্রশ্নের মীমাংসা ২৯ অংশের আইন দ্বারা নিষ্পত্তি হবে-

Nrependra Vs Sitakanta, 15 C.W.N. 158 (161) kamawati Vs Digbijai, 43 ALL 525 (533) (P.C) হিন্দু ধর্ম হতে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির উইল বিহীন সম্পত্তি ভারতীয় উত্তরাধিকার বিধিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তারা হিন্দু ছিল বলে তাদের উত্তরাধিকারের বিধিসমূহ হিন্দু আইনে পরিচালিত হবে এরূপ সাক্ষ্য প্রদর্শনের স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন।

২। ৩৭-৪০ ধারায় বর্ণিত বিধিসমূহ অনুযায়ী উইল বিহীন সম্পত্তি এক বংশসম্ভূত সন্তানগণের অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বন্টন হবে, যদি বিধবা স্ত্রী থাকে তাহলে তার অংশ রাখতে হবে।

৩। উইল বিহীন একটি জীবিত সন্তান বা সন্তানগণ রেখে মারা গেলে, তার মৃত সন্তানের মাধ্যমে যদি কোন অধস্তন না থাকে, তাহলে ৩৭ নং ধারা অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকারী হবে জীবিত সন্তান। সন্তান একাধিক হলে তা সন্তানগণের মধ্যে সমানভাবে বন্টন হবে।

৪। উইল বিহীন সন্তান না রেখে পৌত্র বা প্রপৌত্র রেখে মারা গেলে, সেক্ষেত্রে ৩৮ ধারা অনুযায়ী তার সম্পত্তির অধিকারী হবে পৌত্র বা পৌত্ররা।

৫। মাতা, ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ জীবিত থাকলে এবং কোন ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান জীবিত না থাকলে, সেক্ষেত্রে ৪৩ ধারা অনুযায়ী মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ সম্পত্তিতে সমতুল অংশে উত্তরাধিকারী হবে।

৬। একজন হিন্দু খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে যদি ভ্রাতা, ভগ্নি ও স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ এবং বাকি $\frac{১}{২}$ অংশ ভ্রাতা ও ভগ্নি সমান অংশে পাবে।

৭। বৈধ স্বামী ও স্ত্রীর সন্তানগণকে খৃষ্টান উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু অবৈধ সন্তানগণকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে না।

৮। একজন বিধবা যদি তার বিবাহের পূর্বে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে তার স্বামীর সম্পত্তিতে স্বত্ত্ববান না হয়ে থাকে, তাহলে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির শেয়ারে বঞ্চিত হয়।

৯। ৩৩ ধারায় বর্ণিত বিধি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি যদি তার এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন ব্যক্তিগণকে রেখে যায়, তাহলে তার সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ তার বিধবা স্ত্রী এবং অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ তার এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন ব্যক্তিগণ পাবে।

'এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তানগণ' এর অর্থ হচ্ছে বৈধ স্বামী স্ত্রীর সন্তানগণ। স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক নয়, এমন স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে জন্ম প্রাপ্ত সন্তানগণ উত্তরাধিকারী হবে না। ইংলন্ডনীয় আইনানুসারে বহুবিধ বিবাহের সন্তানগণ উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে।

উপরোক্ত তথ্যাবলীতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, পিতা, মাতা প্রত্যেকেই কমবেশী সমভাবে উত্তরাধিকারী হচ্ছে। অবৈধ অর্থাৎ জারজ সন্তানগণ তাদের জন্মলাভের ব্যাপারে দায়ী নয় বরং যে সকল নারী পুরুষের অবৈধ মিলনের ফলে তারা জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, সে সকল নারী পুরুষরাই দায়ী। জারজ সন্তানরা পিতৃ এবং মাতৃত্বের পরিচয় দিতে পারছে না। উপরন্ত তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকেও করা হয়েছে বঞ্চিত। মানুষ এবং পশুর মধ্যে যেন কোন ভেদাভেদ নেই। যারা জারজ সন্তান

জন্ম দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বরং আইনের মাধ্যমে এটাকে বৈধ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি হচ্ছে বিঘ্নিত। নারীকে মনে করা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী। নারী পুরুষের বিবাহ প্রথার আসল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে নারীকে বানানো হচ্ছে যৌন সম্ভোগের হাতিয়ার। নারী পুরুষের অবাধ যৌন মিলনের স্বাধীনতার মাধ্যমে নারী জীবনকে করা হচ্ছে কলুষিত। যে ধর্ম বা আইন নারীকে মাতৃত্বের মর্যাদাটুকু পর্যন্ত দিতে পারেনি সে সকল আইন উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীকে প্রকৃত পক্ষে কতটুকু অধিকার দিতে পারবে তা সহজেই বোধগম্য।

পক্ষান্তরে ইসলাম নারী জাতিকে বানিয়েছে জীবন সংগিণী, তাদেরকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী বানায়নি। ইসলাম নারীকে দিয়েছে মাতৃত্বের মর্যাদা, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দিয়েছে উত্তম সম্মান এবং উত্তরাধিকার আইনেও প্রদান করেছে শ্রেষ্ঠ অধিকার।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

কন্যার মর্যাদা ও অধিকার

ইসলাম নারীর ব্যাপক মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাক ইসলামী যুগে নারী ছিল সবচেয়ে বেশী অবহেলিতা, ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা ও নির্যাতিতা। কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ তৎকালীন যুগে পিতা মাতার জন্যে ছিল সবচেয়ে বেশী অপমান ও লজ্জাকর। কারোর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে বলে সংবাদ দেয়া হলে পিতার চেহারা মলিন হয়ে যেত। লজ্জা এবং অপমান থেকে মুক্তির জন্যে কোন কোন পিতা তার কন্যাকে নিজ হাতে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। প্রাক ইসলাম যুগে নারীর যখন এ অবস্থা, ঠিক তখনই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হন রাহমাতুল্লিল আ'লামীন বিশ্বনবী (সাঃ)। তিনি কন্যা সন্তানদের লজ্জা ও অপমান থেকে মুক্ত করে তাদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং কন্যা সন্তানদের লালন পালনকে জান্নাত লাভের উপায় বলে ঘোষণা করেন। বিশ্বনবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ٥

অর্থাৎ 'যার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি, তাকে লাঞ্ছিত করেনি এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে বেশী স্নেহ করেনি, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আবু দাউদ শরীফ)

কিছু কিছু লোক আছে যারা পুত্র সন্তান হলে খুব খুশী হন এবং কন্যা সন্তান হলে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এটা অজ্ঞতা এবং নিবুর্দ্ধিতার পরিচয়। মাঝে মাঝে এমন খবরও শোনা যায়, স্বামী নাকি স্ত্রীকে বলে থাকেন যে, যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে স্ত্রীকে রাখবেন না, তালাক দিয়ে দিবেন অথবা দ্বিতীয় বিবাহ করবেন। এটা চরম ইসলাম বিরোধী। যে ব্যক্তি নিজকে মুসলমান বলে দাবী করবে, যার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভয় থাকবে তিনি কখনো স্ত্রীকে এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। তার মনে রাখা উচিত যে, সন্তান আল্লাহর দান। স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সন্তান দিয়ে থাকেন। স্বামী কিংবা স্ত্রীর কারোরই ক্ষমতা নেই সন্তান জন্ম দেবার। স্বামী স্ত্রী কেবলমাত্র উছিলা অর্থাৎ মাধ্যম। কিন্তু সন্তান দানের সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দিয়ে থাকেন, আবার যাকে ইচ্ছে কন্যা

সন্তান দান করেন। সবই আল্লাহর ইচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকেরই ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস রাখতে হবে। অন্যথায় তাকে প্রকৃত মুসলমান বলা হবে না। সুতরাং পুত্র সন্তান হউক বা কন্যা সন্তান, তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা উচিত। পুত্র সন্তান লালন পালনের মধ্যে রয়েছে দুনিয়ার স্বার্থ কিন্তু কন্যা সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে লালন পালন করতে হয়। অবশ্য ইসলামে পুত্র সন্তানদেরও আদর যত্ন করার, উত্তম আদব কায়দা এবং সুশিক্ষা দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানদের তুলনায় অধিক আদর যত্ন দিয়ে লালন পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং পুত্র সন্তানদের লালন পালনকে জান্নাত লাভের উপায় বলেও উল্লেখ করা হয়নি। পক্ষান্তরে কন্যা সন্তানের লালন পালনকে জান্নাত লাভের উপায় বলে হাদিস শরীফে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তির পুত্র এবং কন্যা উভয় সন্তানই থাকে, তাহলে তার উচিত সকল সন্তানদেরই সমান আদর যত্ন, সুশিক্ষা প্রদান করা। পুত্র সন্তানকে যত টাকা মূল্যের পোশাক পরিধান করাবে, কন্যা সন্তানকেও তত মূল্যের পোশাকই পরিধান করানো। যদি কারোর কেবল কন্যা সন্তানই হতে থাকে, তাহলে তাদের সাথে খরাপ ব্যবহার না করে পরিপূর্ণ স্নেহ মমতা দিয়ে লালন পালন করা উচিত। কন্যাদের সুশিক্ষিতা করে তাদেরকে উপযুক্ত ও সৎপাত্রে বিবাহ দেয়া এবং তাদের সাথে দূর্ব্যবহার না করার জন্যে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। এমনিভাবে যদি কোন লোকের ছোট বোন থাকে তাহলে তাকেও আদর সোহাগ দিয়ে লালন পালন করার এবং সুশিক্ষা দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি কন্যা এবং বোনদের সাথে এরূপ ব্যবহার করবে, বিশ্বনবী (সাঃ) তাকে বেহেস্তের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন–

وَمَنْ عَالَ ثَلٰثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اِثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ اِثْنَتَيْنِ حَتّٰى لَوْ قَالُوْا اَوْ وَاحِدَةً فَقَالَ وَاحِدَةً ـ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা অনুরূপ তিনটি বোনকে লালন পালন করেছে, উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাদের সংগে উত্তম ব্যবহার করেছে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, যদি দুইজনের সাথে এরূপ করা হয়? রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, দুইজন হলেও। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, লোকেরা যদি একজনের ব্যাপারেও এরূপ জিজ্ঞেস করত তাহলে তিনি অবশ্য বলতেন, একজন হলেও। (মেশকাত শরীফ)

আল্লাহ্ তা'য়ালা পিতামাতাকে অনেক সময় পুত্র সন্তান না দিয়ে কেবল কন্যা সন্তানই দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা আল্লাহ্ পাক পিতামাতাকে এ পরীক্ষা করতে চান যে, পিতামাতা এ সকল কন্যা সন্তানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেন, যারা চিরদিন পিতামাতার সংগে থাকবে না, পিতামাতাকে আয় রোজগার করে খাওয়াবে না বরং বড় হয়ে স্বামীর গৃহে চলে যাবে। এমতাবস্থায় যদি এ সকল কন্যা সন্তানদের আদর স্নেহ দিয়ে বড় করা হয়, তাহলে এটা পিতামাতার জন্যে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায় হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন–

"একদিন এক মহিলা তার দুইটি কন্যা সন্তান নিয়ে আমার নিকট আসলেন এবং কিছু সাহায্য চাইলেন। সে সময় আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আমি খুরমাটি তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলা খুরমাটিকে দুইভাগ করে সন্তান দুইটিকে দিয়ে দিলেন কিন্তু নিজে একটুও খেলেন না। তারপর তিনি চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) গৃহে প্রবেশ করলেন এবং আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে, কেয়ামতের দিন তারা অর্থাৎ এ সকল কন্যা সন্তানেরা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে দেয়াল হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ)

কন্যা সন্তানকে যতদিন পর্যন্ত বিবাহ দেয়া না হবে ততদিন পিতামাতার দায়িত্ব হল সন্তানকে আদর সোহাগ দিয়ে লালন পালন করা, সুশিক্ষা দেয়া এবং সৎপাত্রে বিবাহ দেয়া। কিন্তু কন্যা সন্তানের উপর পিতার দায়িত্বকে ইসলাম এখানেই শেষ করে দেয়নি। কন্যা সন্তানের দৈহিক ত্রুটি ও অসৌন্দর্যের কারণে

যদি তার বিয়ে না হয় অথবা বিয়ের পর যদি সে তালাক প্রাপ্তা কিংবা বিধবা হয়ে পিতার গৃহে ফিরে আসে তখনো কন্যা সন্তানের ভরণ পোষণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পিতাকে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বনবী (সাঃ) সুরাকা ইবনে মালিক (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেন–

اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ ـ

অর্থাৎ "আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সাদকার কথা বলব না? তোমার কন্যা যখন (নিরুপায় হয়ে, বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হয়ে স্বামীর গৃহ হতে) তোমার নিকট ফিরে আসে, আর তুমি ব্যতীত তাকে রোজগার করে খাওয়াবার কেউ না থাকে।" (ইবনে মাজা)

এ অবস্থায় কন্যার ভরণ পোষণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হচ্ছে পিতার উত্তম সদকা। এতে করে পিতামাতা যাতে অসন্তুষ্ট না হয় এবং নিজের ও সন্তানের উপর কোন প্রকার বদদোয়া না করে সে জন্যেও বিশ্বনবী (সাঃ) পিতামাতাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন–

لَاتَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَاتَدْعُوْا عَلٰى اَوْلَادِكُمْ وَلَاتَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের উপর বদদোয়া করো না, সন্তানদের উপর বদদোয়া করো না এবং তোমাদের ধন সম্পদের উপরও বদদোয়া করো না।'

কোন শিশু সন্তানের পিতা যদি মারা যায় তাহলে মাতার উচিত শিশু সন্তানদেরকে আদর স্নেহ দিয়ে লালন পালন করা। সন্তান কন্যা হউক বা পুত্রই হউক। এ অবস্থায় মাতা অর্থাৎ বিধবা স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে এ অধিকার ইসলাম তাকে দিয়েছে। দ্বিতীয় স্বামী যদি এতীম সন্তানদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন তাহলে এটা তার জন্যে ছওয়াবের কাজ হবে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবেন। দ্বিতীয় স্বামী যদি এতীম সন্তানদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় কিংবা বিবাহ পূর্ব সময়ে স্বীকৃতি দিলেও বিবাহত্তোর এ ব্যাপারে আশংকা দেখা দিতে পারে বলে মনে হয়, তাহলে এ অবস্থায় এতীম

সন্তানদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে বিধবা স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ না করার জন্যে আল্লাহর রাসুল উপদেশ দিয়েছেন এবং এটাই উত্তম কাজ। যদি কোন বিধবা স্ত্রী তার এতীম সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজকে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত ও পবিত্র রাখে এবং কোন প্রকার যৌন লাম্পট্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিষ্কলঙ্ক ভাবে জীবন যাপন কাটিয়ে যায়, তাহলে সে বিশ্বনবী (সাঃ) এর সংগে বেহেস্তে পাশাপাশি অবস্থান করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল ইরশাদ করেছেন–

أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ إِلَى الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ إِمْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوْا أَوْ مَاتُوْا۔

অর্থাৎ 'আমি এবং বিবর্ণা চেহারার ঐ মহিলা কিয়ামতের দিন এ দু'টি আংগুলের ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করব (ইয়াযিদ ইবনে যুরাই (রাঃ) এ হাদিস বর্ণনাকালে মধ্যমা ও শাহাদাত আংগুলের দিকে ইংগিত করেছেন) যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী রমণীর স্বামী মারা গিয়েছে এবং সে স্বামীর ঔরষজাত এতীম সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের পৃথক হওয়া অথবা মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রয়েছে। (আবু দাউদ শরীফ)

এমনিভাবে ইসলাম কন্যা হিসেবে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে।

স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার

প্রাক ইসলাম যুগে স্ত্রী হিসেবে নারীদের করুণ অবস্থার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ইসলাম এ কথা অবশ্য স্বীকার করে যে, স্বামীকে বাদ দিয়ে যেমন সংসার চলে না তদরূপ স্ত্রীকে বাদ দিয়েও সংসার চলে না। একমাত্র ইসলামই স্ত্রী হিসেবে নারীদেরকে তাদের লাঞ্চনময় জীবন থেকে মুক্ত করে মর্যাদা ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার অধিকার প্রদান করেছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমন এক বস্তুকে ঘৃণা করবে যাতে আল্লাহ (তোমাদের জন্য) অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (সুরা– নিসা, আয়াত–১৯)

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর স্বার্থপর ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক রয়েছে যারা স্ত্রীর মর্যাদাকে স্বীকার করতে নারাজ। স্ত্রীর সাথে অসদাচরণ করে থাকে এবং এ কথাও প্রকাশ করে যে, পায়ের জুতা লাগলে লাগবে, নতুবা বদল করে নিব। অর্থাৎ স্ত্রীকে পায়ের জুতার সাথে তুলনা করে থাকে। এ সকল উক্তি প্রকাশ্য ইসলাম বিরোধী। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন স্ত্রীকে স্বামীর পায়ের জুতার সাথে নয় বরং পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন। পোশাকের প্রতি যে রকম যত্ন নেয়া হয়, স্ত্রীর প্রতিও তদরূপ যত্ন নেয়া উচিত। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۝

অর্থাৎ 'তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরাও (স্বামীগণ) তাদের ভূষণ স্বরূপ।' (সুরা– বাকারা, আয়াত–১৮৭)

ইসলাম কেবলমাত্র স্বামীকেই অধিকার দেয়নি বরং স্ত্রীকেও অধিকার প্রদান করেছে। কেউ কারোর অধিকারকেই ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। যেহেতু পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বামীর দায়িত্ব অনেক বেশী, সেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন স্বামীদের মর্যাদাকে স্ত্রীদের উপর একগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ

সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط

অর্থাৎ 'স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের যেমন অধিকার রয়েছে, স্বামীদের প্রতিও স্ত্রীদের তেমনি অধিকার রয়েছে। আর স্ত্রীদের উপর স্বামীদের একগুণ মর্যাদা বেশী আছে।' (সুরা- বাকারা, আয়াত-২২৮)

স্বামীদের যে একগুণ মর্যাদা অধিক দেয়া হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যবহার করবে, স্ত্রীর অধিকারকে স্বীকার করবে না, স্ত্রীর সাথে দাসদাসীর ন্যায় আচরণ করবে, যখন খুশী যে স্থানে খুশী স্ত্রীকে মারধর করবে।

বিশ্বনবী (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোর ভাষায় বলেছেন-

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ -

অর্থাৎ 'স্ত্রীকে মুখমন্ডলে প্রহার করবে না, তাদেরকে মন্দ গালি দিবে না এবং রাগের বশবর্তী হয়ে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিবে না। (আবু দাউদ শরীফ)

আল্লাহর রাসুল আরো কঠোর ভাষায় বলেছেন-

وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ -

অর্থাৎ 'সাবধান, দাস দাসীদেরকে যেভাবে মারধর করা হয়, সেভাবে স্ত্রীদেরকে মারধর করবে না।'

এর অর্থও আবার এ নয় যে, দাস দাসীদেরকে ইচ্ছেমত মারধর করা যাবে। উদ্দেশ্য এ যে, সাধারণত দাসদাসীদের সাথে যতটুকু নির্দয় ব্যবহার করা হয়, স্ত্রীদের সাথে তদরূপ ব্যবহার করাও যাবে না। বিশ্বনবী (সাঃ) স্ত্রীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আরো বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী পিটানো স্বভাবের লোক তারা ভাল মানুষ নয়।' (আবু দাউদ শরীফ)

তবে স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য এবং দুশ্চরিত্রা হয়, তাহলে স্ত্রীর শাসন করার ক্ষমতা ইসলাম স্বামীকে দিয়েছে। কিন্তু শাসনের নামে স্বামী স্ত্রীর চেহারায় কোন আঘাত করতে পারবে না এবং এমনভাবে শাসন করতে পারবে না, যার দরুন

স্ত্রীর শরীরে ক্ষত হতে পারে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফরমায়েছেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ۔

অর্থাৎ 'কোন মুমিন স্বামী তার মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। যদি তার কোন একটি অভ্যাস পছন্দ নাও লাগে, তবে তার মধ্যে অন্যান্য অভ্যাসগুলি অবশ্য ভাল লাগবে।' (মুসলিম শরীফ)

কখনো কখনো এরূপ তথ্যও শোনা যায় যে, কতিপয় স্বামী হাটে বাজারে গিয়ে স্ত্রীর অগোচরে ভাল ভাল খাবার খেয়ে আসে, বাড়িতে এসেও খানা খাওয়ার সময় পাতিল থেকে বড় মাছ ও মাংসের টুকরাগুলো খেয়ে ফেলে এবং বলে স্বামীদের নাকি বেশী খেতে হয় এবং প্রথম খেতে হয়। স্ত্রী খেয়েছে কিনা? কি খেয়েছে? কেন খায়নি এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসিন। স্বামী নিজে উন্নতমানের এবং দামী কাপড় পরিধান করে, অন্যদিকে স্ত্রীকে দেয় নিম্নমানের কাপড়। কিন্তু ইসলাম এটাকে কখনো সমর্থন করে না। আল্লাহর রাসুল বলেছেন–

اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَبْتَ ۝

অর্থাৎ 'তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে। আর তুমি যখন (যে মূল্যের) কাপড় পরিধান করবে তাকেও (সে মূল্যের) কাপড় পরিধান করাবে। (আবু দাউদ শরীফ)

রাসুলে করিম (সাঃ) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।'

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদার অর্থ এ নয় যে, স্বামী যেরূপ কাজকর্ম করবে, স্ত্রীও সেরূপ কাজকর্ম করতে পারবে, স্বামী যেমন মাঠে হাল চাষ করবে, স্ত্রীও মাঠে গিয়ে হাল চাষ করতে পারবে, স্বামী যেরূপ প্যান্ট শার্ট পরিধান করবে স্ত্রীও তদরূপ পোশাক পরিধান করতে পারবে, স্বামী যেমন লুংগি গেঞ্জি পরিধান করে নামায পড়বে, স্ত্রীও সেরূপ পোশাক পরিধান করে নামায আদায় করতে পারবে, পুরুষ যেমন স্টেডিয়ামে গিয়ে হাজার হাজার পুরুষের সম্মুখে খেলাধূলা করবে, নারীও তদরূপ করতে পারবে। যেহেতু নারী এবং পুরুষের দৈহিক গঠনের মধ্যে আল্লাহ পাক পার্থক্য করে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু কর্মক্ষেত্র হিসেবে নারী এবং পুরুষের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। কিন্তু অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে ইসলাম নারী এবং পুরুষের প্রত্যেকেরই সমান

অধিকার দিয়েছে। যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদিতে নারীকে অধিকার দিয়েছে ইসলাম। এ সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে কিন্তু অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন একটি আবরণ তথা পর্দার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিত করার জন্যেই হয়েছে। হরিণ একটি সুন্দর প্রাণী। তার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে বন। বনে থাকে বলেই সবাই তাকে ভালবাসে এবং তার মর্যাদাও অক্ষুণ্ন রয়েছে। অর্থ ব্যয় করে মানুষ তাকে দেখতে যায় চিড়িয়াখানায়। হরিণ যদি বন ছেড়ে রাস্তাঘাটে কিংবা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে উন্মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াত তাহলে কি হরিণের প্রতি সবার ভালবাসা থাকত? নিশ্চয় না। তদরূপ নারীর মর্যাদা রয়েছে আবরণের মধ্যে। ইসলাম নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সর্ব বিষয়ে অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কতিপয় নারী ইসলাম প্রদত্ত আবরণ, তথা পর্দার বিধানটিকে উপেক্ষা করার কারণে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকার থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। মানব রচিত বিভিন্ন আইন তৈরী করেও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। কারোর যদি নিরাপত্তারই গ্যারান্টি না থাকে তাহলে অধিকার ভোগ করা তো সম্ভবই নয়। একজন পর্দানশীন তথা বোরখা পরিহিতা নারীকে সবাই সম্মান করে থাকে। রাস্তাঘাটে কোন বোরখা পরিহিতা নারী পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েছে এমন তথ্য খুবই কম। অপরদিকে হত্যা, ধর্ষণ, খুন, ঘুষ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদির অধিকাংশই ঘটে থাকে বোরখাহীন কিংবা অর্ধ উলঙ্গ নারীদের ক্ষেত্রে। শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মাঝে মাঝে দেখা যায়, বোরখাহীন, উড়নাহীন কিংবা অর্ধ উলঙ্গ নারীদের দেখে যুবক শ্রেণীর ছেলেরা অশালীন উক্তি করে থাকে। এ ধরনের কাজকে ইসলাম সমর্থন করে না। কারোর প্রতি অশালীন উক্তি করা গুনাহের কাজ। আসলে যে আবরণটির মাধ্যমে নারীর প্রতি এবং মাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে সেটি বর্তমানে অধিকাংশ নারীদের মধ্যে নেই। ইসলামকে উপেক্ষা করার কারণে আইন করেও নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারছে না।

দেশ গড়ার কাজে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম এটাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু আবরণের মাধ্যমে হতে হবে। যেমন নেগেটিভ এবং পজেটিভ এ দু'য়ের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, পাখা ঘুরে। এমনিভাবে

তৈল এবং পানি এ দু'য়ের মাধ্যমে উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদি চলে। অবশ্য নেগেটিভ ও পজেটিভ কিংবা তৈল ও পানি এ দু'টিকে আবরণের মাধ্যমে পৃথক রাখা হয়েছে। তারা পৃথকভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। যদি গতিবেগ বাড়ানোর জন্যে এ দু'টোকে একত্র করে দেয়া হয় তাহলে গতিবেগ তো বাড়বেই না বরং বিস্ফোরণ ঘটবে। তদরূপ নারী এবং পুরুষ দেশ গড়ার কাজে ভূমিকা রাখবে পৃথকভাবে অর্থাৎ আবরণের মাধ্যমে। যদি সর্বক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষকে একত্র করে দেয়া হয়, তাহলে বিস্ফোরণ ঘটা স্বাভাবিক। তাই ইসলাম পর্দার বিধান দিয়েছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত পুরুষের দায়িত্ব অনেক বেশী এবং সংসারের সকলের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে হয় স্বামীকে। তাই আল্লাহ পাক স্বামীর মর্যাদা একগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সমান। একগুণ মর্যাদা বেশী পাবার কারণে স্বামী যাতে তার মর্যাদার অপব্যবহার না করে সে জন্যেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বামীর এ একগুণ মর্যাদা নিয়ে হিংসা করা কিংবা পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা কোন সতী সাধবী স্ত্রীর কাজ নয়। এছাড়া উপরোক্ত মর্যাদা টুকু পাবার জন্যে আকাঙ্খা করাও উচিত নয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط

অর্থাৎ 'তোমরা এমন কোন মর্যাদার আকাঙ্খা করো না, যাতে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কাউকে কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। পুরুষদের জন্যে তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যেও তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে। (সুরা– নিসা, আয়াত–৩২)

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন বিশ্বনবী (সাঃ) স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপর এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের দিন আরাফাতের প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ তৌহিদী জনতার সামনে ভাষণদানকালেও নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদার কথা ভুলেননি। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) মুসলিম জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

اَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ۔ اَلَا اِنَّ

لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا - عَلٰى وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ

اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ -

অর্থাৎ '(হে লোক সকল) তোমাদের স্ত্রীদের সংগে ভাল ব্যবহার করবে। কেননা, তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মতো। মনে রেখো, স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীদের তেমন অধিকার আছে। শুনে রাখ, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো উত্তম রূপে তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। (তিরমিজি শরীফ)

স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ইসলাম স্বামীকে স্বীয় ইচ্ছামত বহু বিবাহ করার বিধান দেয়নি। এক সাথে ৪ জন স্ত্রী রাখার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তাও শর্ত সাপেক্ষে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً -

অর্থাৎ 'তোমরা যদি এ আশংকা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীতেই ক্ষ্যান্ত থাকবে।'

অর্থাৎ এ অবস্থায় একাধিক বিবাহ করা স্বামীর জন্যে বৈধ নয়। যেহেতু একাধিক বিবাহে সমতা রক্ষার বিধান দেয়া হয়েছে, আর এটা পুরুষদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কাজেই বহু বিবাহ করার ঢালাও সুযোগ আর থাকে না।

ইসলাম স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সময় স্ত্রীকে মোহর প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। এ মোহরের উপর স্ত্রীর একক অধিকার। স্ত্রীকে মোহরের টাকা পরিশোধ না করা, গড়িমশি করা, কিংবা কৌশলে স্ত্রীর নিকট হতে মাফ করিয়ে নেয়া মারাত্মক গুণাহের কাজ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন–

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً -

অর্থাৎ 'স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরের টাকা প্রসন্ন মনে দিয়ে দাও।'

মোহরের মাধ্যমে বৈবাহিক সূত্রে স্ত্রীর অধিকারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এছাড়া স্বামীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ স্বামী দিনের বেলা সমাজে কি বলে আর রাতের

অন্ধকারে কি করে তা স্ত্রীই অন্যদের তুলনায় ভাল জানেন। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।'

(আল হাদিস)

কোন সতী নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দেয়া মারাত্মক গুণাহের কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেউ যদি সতী নারীদের সম্পর্কে অপবাদ দেয়, তাহলে তার দাবীর সপক্ষে প্রত্যক্ষদর্শী কমপক্ষে ৪ জন স্বাক্ষী উপস্থিত করার জন্যে পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাধারণত ২/৩ জন পুরুষের কথায় কোন নারীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। যদি কমপক্ষে ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে একজন নারীর ব্যাপারে অপবাদ দিয়ে তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা ও তার চরিত্রকে কলুষিত করার অপরাধে ঐ পুরুষের পাল্টা বিচার করা এবং চিরদিনের জন্যে কোন বিষয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ
فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۔

অর্থাৎ 'যারা কোন সতী রমণীকে (জ্বিনার) অপবাদ দেয়, অতপর প্রত্যক্ষদর্শী ৪ জন স্বাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে এরূপ লোকদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত লাগাও এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। তারা হচ্ছে দুষ্কৃতিকারী। (সুরা– নূর, আয়াত–৪)

এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বহু বিবাহ ও তালাক

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণের কেউ কেউ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বহু বিবাহ রোধ, পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহই নিষিদ্ধকরণ এবং স্ত্রীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা দাবী করছেন।

এ প্রসংগে আমি বলব, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এ সবকিছুরই সমাধান দিয়েছে ইসলাম। প্রাক ইসলাম যুগে বহু বিবাহের মাধ্যমে নারীর জীবনকে করা হয়েছিল কলুষিত। ইসলামই বহু বিবাহকে রোধ করেছে। ইসলামে এক সাথে ৪ জন স্ত্রী রাখার যে বিধান রাখা হয়েছে তা বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না। একাধিক বিবাহ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পুরুষদেরকে ব্যাপকভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেননি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۝

অর্থাৎ 'তোমরা যদি আশংকা কর যে, সবার মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না তাহলে একজন স্ত্রীতেই ক্ষ্যান্ত থাকবে।' অর্থাৎ সকল স্ত্রীদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তথা ভরণ পোষণ, মায়া মমতা ও ভালবাসার ক্ষেত্রে যদি সমতা রক্ষা করা যাবে না বলে আশংকা হয়, তাহলে একের অধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ। সুতরাং বহু বিবাহ করার ঢালাও সুযোগ ইসলামে নেই বরং বহু বিবাহকে ইসলাম রোধ করেছে। ইসলামে যদিও ৪ জন স্ত্রী রাখার বিধান রাখা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, স্বামী একজন স্ত্রীকে ঘরে রেখে স্বীয় ইচ্ছামত আরো ২/৩টি বিবাহ করে নিবে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যেই ইসলামী অনুশাসন না থাকার কারণে তারা ইসলামকে উপেক্ষা করে স্বীয় ইচ্ছামত একাধিক বিবাহ করে যাচ্ছে। এছাড়া দেশে ইসলামী শাসন না থাকার কারণে ঐ সকল পুরুষদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। নারীর সত্যিকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইসলামের কোন বিকল্প নেই। ইসলামে এ বিধান রাখা হয়েছে, নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই। পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহই যদি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে নারীর অধিকারকেই খর্ব করা হবে এবং এটা হবে স্ববিরোধীতার সামিল। উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রী যদি বিধবা হয় তাহলে বিধবা স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অধিকার ও স্বাধীনতা ইসলাম বিধবা স্ত্রীকে দিয়েছে। বিধবা স্ত্রী ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় বিবাহ করে সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে

তুলতে পারবে। কিন্তু বিবাহ ব্যতীত যৌন লাম্পট্যকে ইসলাম প্রশ্রয় ও সমর্থন দেয় না। সুতরাং কোন বিধবা নারী যদি বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে একজন পুরুষের তো অবশ্যই প্রয়োজন। একজন কুমারী রমণী যেমন কোন বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করতে সন্তুষ্টচিত্তে রাজি হতে চায় না তদরূপ কোন অবিবাহিত পুরুষ কী বিধবা রমণীকে বিবাহ করার জন্যে সকল ক্ষেত্রে সন্তুষ্টচিত্তে রাজি হবে? উত্তর যদি নাবাচক হয় তাহলে একজন বিবাহিত পুরুষেরই প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিবাহই যদি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে এমতাবস্থায় বিধবা নারীকে বিবাহ করবে কে? ফলে বিধবা নারীদেরকে ঘৃণ্যতম কাজের দিকে ঠেলে দেয়ার সামিল হবে না?

এছাড়া স্ত্রী যদি মরণ ব্যাধি কিংবা এমন কোন মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যার দরুন স্বামী সহবাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে স্বামীর জৈবিক চাহিদা পুরণের জন্যে দ্বিতীয় বিবাহের কী প্রয়োজন হবে না? দ্বিতীয় বিবাহই যদি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় দেশে ধর্ষণ, নারী অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়বে এবং পৃথিবীতে নারী পুরুষের জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। তাই ইসলামে দ্বিতীয় বিবাহের বিধান রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি পুরুষত্বহীন কিংবা মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে স্ত্রীও ইচ্ছে করলে ইসলামী আদালতের মাধ্যমে স্বামীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ইসলাম নারীকেও সে অধিকার দিয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করা হলে এ অবস্থায় স্বামী পুরুষত্বহীন হবার কারণে স্ত্রী তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্যে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ফলে দেশে নারী পুরুষের যৌন লাম্পট্য ছড়িয়ে পড়বে এবং নারী পুরুষের জীবন হবে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। এটা ইসলামে ঘৃণারও নীচে। আল্লাহ পাক হলেন অসীম জ্ঞানী। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান হল সীমিত। মানব জীবনের বহু দিক বিবেচনা করেই আল্লাহ পাক একাধিক বিবাহের বিধান রেখেছেন মাত্র। দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করা হলে এটা হবে ইসলাম ও মানবতা বিরোধী। এতে পুরুষের তুলনায় নারীর অধিকারকেই খর্ব করা হবে।

তালাক প্রসংগে আমি বলব, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক স্বাধীনতা ও অধিকার ইসলাম স্বামীকেও দেয়নি। তালাক দেয়াকে ইসলাম ঘৃণা করে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন স্বামী স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তালাক দেয়ার জন্যে নয় বরং একে অপরের নিকট শান্তিতে বসবাস করার জন্যে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٥

অর্থাৎ "আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট (শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে) বসবাস করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ সকল বিষয়ের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।" (সুরা- রূম, আয়াত-২১)

সুতরাং বিনা অপরাধে কিংবা সামান্যতম অপরাধের কারণে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জগণ্যতম অপরাধ। বিশ্বনবী (সাঃ) ফরমায়েছেন, "কোন মুমিন স্বামী তার মুমিনা স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। যদি তার কোন একটি অভ্যাস পছন্দ নাও লাগে তাহলে তার মধ্যকার অন্যান্য স্বভাবগুলো তার নিকট অবশ্য ভাল লাগবে।" কাজেই সামান্যতম অপরাধের কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। এটা গুণাহের কাজ। তালাক প্রদান যদিও ঘৃণার বস্তু তথাপি তালাকের বিধান রাখা হয়েছে স্বামী স্ত্রী উভয়ের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। দেশে ইসলামী শাসন না থাকার কারণে কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে যে কারণে এবং যেভাবে তালাক দিয়ে থাকে, এ ধরনের তালাক প্রদানের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ইসলাম স্বামীকে দেয়নি। তালাকের বিধান যদি একেবারে নাই থাকত তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জীবন হত আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মত দুর্বিষহ। তালাক হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের অশান্তি জীবন থেকে মুক্তি লাভের পথ। তালাক প্রদানের অধিকার ইসলাম স্বামী স্ত্রী উভয়কেই প্রদান করেছে এবং এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে ধৈর্যের একেবারে শেষ পর্যায়ে। স্ত্রী যদি অবাধ্য কিংবা দুঃশ্চরিত্রা হয় তাহলেই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আদেশ ইসলাম স্বামীকে দেয়নি। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাকে স্থায়ী করার জন্যে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে-

১) প্রথমে স্ত্রীকে উপদেশ দিতে হবে এবং ভালবাসা ও মায়ামমতার সাথে বুঝাতে হবে। এতে যদি স্ত্রী নিজকে সংশোধন না করে তাহলে

২) রাতের বেলা স্ত্রীর বিছানা পৃথক করে দিবে এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরও যদি স্ত্রী সংশোধিত না হয় তাহলে

৩) স্ত্রীকে হালকা প্রহার করবে। কিন্তু স্ত্রীর চেহারায় আঘাত করা যাবে না এবং স্ত্রীকে এমনভাবে মারধর করা যাবে না, যার দরুন স্ত্রীর শরীরে কোন ক্ষত হতে পারে। হালকা সামান্য প্রহার করার পরও যদি স্ত্রী স্বামীর অনুগত না হয় তাহলে

৪) স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিবে এবং স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা নষ্ট হয়ে যাবার ভয় দেখাবে। এছাড়া স্ত্রীর পিত্রালয়ে আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে স্ত্রীকে বুঝাবে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরও যদি স্ত্রী নিজকে সংশোধন না করে তাহলে

৫) এমতাবস্থায় স্ত্রীকে পবিত্রাবস্থায় এক তালাকে রেজী দিবে। এতে স্ত্রী যদি নিজকে সংশোধন করে এবং স্বামীর বাধ্য হবে বলে অংগিকার করে তাহলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবে এবং স্ত্রীকে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিবে। উল্লেখ্য যে, তালাকে রেজী প্রদানের কারণে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে ইদ্দতের ভিতরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে পুনরায় নতুন করে মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ করতে হবে। এক তালাকে রেজী প্রদানের পরও যদি স্ত্রী বাধ্য না হয় তাহলে

৬) দ্বিতীয় মাসে পবিত্রাবস্থায় স্ত্রীকে দুই তালাকে রেজী দিবে দুই তালাকে রেজী দেয়ার পর যদি স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হবে বলে অংগিকার করে তাহলেও স্ত্রীকে স্বামী ফিরিয়ে আনবে, স্ত্রীকে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিবে এবং একত্রে বসবাস করবে। আর যদি এতেও স্ত্রী স্বামীর বাধ্য না হয় তাহলে

৭) তৃতীয় মাসে পবিত্রাবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক দিবে। তিন তালাক দেয়ার পর উহা বাইন হয়ে যাবে। এতে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে ভেংগে যাবে এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

এছাড়া এক অথবা দুই তালাকে রেজী দেয়ার পর যদি ইদ্দত পার হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী তালাক দেয়ার আর কোন প্রয়োজন হয় না। তালাকে রেজীর ইদ্দত পার হবার পর স্ত্রী ইচ্ছে করলে অন্য পুরুষের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আর যদি প্রথম স্বামীর নিকটই ফিরে আসতে চায় এবং প্রথম স্বামীও আনতে রাজি থাকে তাহলেও আসতে পারবে। তবে প্রথম স্বামী এ স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করতে চাইলে আবার নতুন করে মোহর নির্ধারণ করে বিবাহ করতে হবে।

স্ত্রীকে শাসন করার ব্যাপারে বিশ্বনবী (সাঃ) ফরমায়েছেন, "স্ত্রীদের সংগে একমাত্র তখনই কঠোর ব্যবহার করা যেতে পারে যখন তারা প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যদি তারা ঐরূপ আচরণ করে তাহলে তাদের থেকে রাতের বেলা বিছানা পৃথক করে নাও এবং এ পরিমাণ প্রহার কর যাতে কোন যখম না হয়। এমতাবস্থায় তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের কষ্ট দেয়ার জন্যে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করো না। (তিরমিজি শরীফ)

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রীকে বিনা অপরাধে কিংবা সামান্যতম অপরাধে যখন তখন তালাক দেয়ার ক্ষমতা ইসলাম স্বামীকে দেয়নি। তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সর্বশেষ পর্যায়ে। এ তালাকের জন্যে স্বামী দায়ী নয় বরং স্ত্রীর সীমাহীন অবাধ্যতা ও দুশ্চরিত্রই দায়ী। সুখী দাম্পত্য জীবন লাভ করার অধিকার স্বামী স্ত্রী উভয়েরই রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীকে বারবার উপদেশ দেয়ার পরও যদি স্ত্রী সীমাহীন অবাধ্য এবং দুশ্চরিত্রা হয় তাহলে প্রকৃত অপরাধী কে? স্বামী নাকি স্ত্রী? সুতরাং তালাকের বিধান রাখা হয়েছে স্বামী স্ত্রী একে অপরের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যে। এ তালাক প্রদানের ক্ষমতা ইসলাম স্ত্রীকেও দিয়েছে। স্ত্রী ইচ্ছে করলে তালাকে খলা করতে পারবে। এছাড়া স্বামী যদি চরিত্রহীন, অত্যাচারী, পুরুষত্বহীন কিংবা মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হয় অথবা নিরুদ্দেশ হয় তাহলে স্ত্রী ইসলামী আদালতের মাধ্যমে স্বামীকে তালাক দিতে পারবে এবং স্বীয় ইচ্ছামত দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে। ইসলাম স্ত্রীকেও সে অধিকার দিয়েছে। তথাকথিত নারীমুক্তিবাদীদের দাবী অনুযায়ী বিনা কারণে এবং বিনা অপরাধে স্বামীকে তালাক দেবার অবাধ স্বাধীনতা ও অধিকার যদি স্ত্রীদেরকে দেয়া হয় তাহলে নারীমুক্তিবাদীদের কারো কারো মতো কতিপয় স্ত্রীর মাসে মাসে স্বামী বদল করার আশংকাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ফলে দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি এবং পরিবার কাঠামো তাসের ঘরের মত ভেংগে পড়বে। সুতরাং বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই। প্রতিটি মুসলিম নরনারী যদি ইসলামের অনুশাসন মেনে চলত এবং দেশে ইসলামী শাসন কায়েম হত তাহলে নিঃসন্দেহে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত। ইসলামকে উপেক্ষা করে মানব রচিত আইন দিয়ে নারীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কেবলমাত্র ইসলামী আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে।

মাতার মর্যাদা ও অধিকার

ইসলামে মাতা হিসেবে নারীর মর্যাদাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। মাতাকে এত বেশী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যা পিতাকেও করা হয়নি আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ফরমায়েছেন–

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ ۰

অর্থাৎ "মাতার পদতলে সন্তানের বেহেস্ত।" কিন্তু পিতার পদতলে সন্তানের বেহেস্ত এ ধরনের বক্তব্য কোন হাদিসে নেই। এতে সন্তানের নিকট পিতার তুলনায় মাতার মর্যাদাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সন্তানের নিকট থেকে সেবাযত্ন পাবার অধিকার পিতার চেয়ে মাতার বেশী। হাদিস শরীফে রয়েছে–

قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ ـ

অর্থাৎ "একদা কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার নিকট হতে সদ্ব্যবহার পাবার সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।" (সহী বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে, সন্তানের নিকট মাতার মর্যাদা তিন গুণ আর পিতার মর্যাদা হল মাত্র এক গুণ। বিশ্বনবী (সাঃ) এর বয়স যখন মাত্র ৬ বছর তখন গর্ভধারিণী মাতা বিবি আমেনা ইন্তেকাল করেন। নবীজীর শিশুকাল কেটেছিল দুধ মাতা বিবি হালিমার নিকট। কাজেই মায়ের সেবা করার সুযোগ তিনি পাননি। বিশ্বনবী (সাঃ) তাঁর দুধ মাতার সাথে যেরূপ ব্যবহার ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, তাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মাতার মর্যাদা সন্তানের নিকট কত বেশী এবং তিনি যদি গর্ভধারিণী মাতাকে পেতেন তাহলে কত সম্মান প্রদর্শন করতেন। হাদিস শরীফে রয়েছে–

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِىَ قَالُوْا هِىَ اُمُّهُ الَّتِىْ اَرْضَعَتْهُ ـ

অর্থাৎ "হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জারানা নামক স্থানে গোস্ত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং রাসুলুলাহ (সাঃ) নিজের শরীরের চাদর খানা বিছিয়ে দিলেন। তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মহিলা কে? লোকেরা বলল, ইনি হলেন তাঁর মাতা, যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন (এ দুধ মাতা ছিলেন বিবি হালিমাতুস সাদিয়া)।

(আবু দাউদ শরীফ)

পাঠকগণ, বিশ্বনবী (সাঃ) এর যে চাদর মোবারক খানায় স্বয়ং জিবরাঈল (আঃ)ও বেয়াদবী হয়ে যাবার ভয়ে বসতে রাজি হননি, সে চাদর মোবারকখানা নবীজী (সাঃ) নিজ শরীর থেকে খুলে দুধ মাতাকে বিছিয়ে দিলেন এবং দুধ মাতা হালিমা এর উপর বসে নবীজীর সাথে আলাপ করলেন, এর চেয়ে অধিক সম্মান আর কি হতে পারে? শুধুমাত্র দুধ পান করানোর কারণে বিশ্বনবী (সাঃ) দুধ মাতার যে মর্যাদা ও অধিকার দেখিয়েছেন, সে তুলনায় আপন মাতা যিনি একাধারে গর্ভধারিণী, স্তন্যদায়িনী, লালনকারিণী, শিক্ষয়িত্রী, সেবিকা এবং স্নেহশীলা তার মর্যাদা ও অধিকার নিঃসন্দেহে সর্বাধিক হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ـ

অর্থাৎ "আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি; তার মাতা তাকে অতি কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। (সুরা- আহকাফ, আয়াত-১৫)

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ "আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বৎসর পর্যন্ত স্তন্যদান করেছে, (আর এ নির্দেশও প্রদান করেছি যে,) তুমি আমার ও তোমার মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা আদায় কর, আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সুরা- লোকমান, আয়াত-১৪)

সন্তানের জন্যে মাতার যে সীমাহীন ও সুদীর্ঘ কষ্ট সহ্য করতে হয় সে সম্পর্কে ইসলাম অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তাই ইসলাম মাতা হিসেবে নারীকে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম মাতাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পরেই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। মাতা যদি অমুসলিম কিংবা চরিত্রহীনা হয়, এমনকি সন্তানকে শিরকের মত জঘন্যতম পাপ কাজে লিপ্ত হবার জন্যেও আদেশ করে তথাপি মাতার সহিত বেয়াদবী কিংবা অসদ্ব্যবহার করা যাবে না।

এ সম্পর্কে ইংগিত করে মহান আল্লাহ পাক বলেন-

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ه

অর্থাৎ "আর যদি তোমার মাতাপিতা আমার সহিত শিরক করার জন্যে তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার নিকট কোন প্রমাণ নেই, তাহলে (এক্ষেত্রে) তুমি তাদের আদেশ অমান্য করবে বটে, কিন্তু জাগতিক ক্ষেত্রে তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখবে।

(সুরা- লোকমান, আয়াত-১৫)

হাদিস শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আমার মুশরিক মা (দুধ মা) আমার নিকট আসলেন। আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা (মুশরিক দুধ মাতা) এসেছেন এবং তিনি আমার নিকট কিছু চান।

আমি কি তাকে কিছু দিতে পারি? তিনি বললেন, হাঁ, তাঁর সংগে সদয় এবং উত্তম ব্যবহার কর। (সহী বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

কিন্তু আফসোস, সন্তানের নিকট মাতার মর্যাদা ও অধিকার পিতার চেয়ে অধিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে কতিপয় লোক মাতার তেমন কোন সেবাযত্ন করে না। মাতাকে ধমক দিয়ে কথা বলে। মাতার কোন আদেশ নিষেধ পালন করাকে একেবারেই গুরুত্ব দেয় না। সম্পত্তির লোভে তারা মাতার তুলনায় পিতাকে অধিক সম্মান ও সেবাযত্ন করে। সম্পত্তির লোভে মাতাপিতাকে সেবাযত্ন করা মারাত্মক অন্যায়। মাতাপিতা উভয়কেই মর্যাদা ও সেবাযত্ন করতে হবে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। সম্পত্তি পাবার জন্যে নয়। কেউ যদি কেবলমাত্র সম্পত্তি পাবার জন্যে মাতাপিতাকে সেবাযত্ন করে তাহলে এ সেবাযত্নের জন্যে সে ছওয়াব পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। মাতাপিতা উভয়েরই মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে, তবে পিতার তুলনায় মাতার সেবাযত্ন করতে হবে বেশী যা ইতিপূর্বে হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবে না, আর মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে লক্ষ্য করে কখনো উহঃ পর্যন্ত করো না, আর তাদেরকে ধম দিয়ে কথা বলো না বরং তাদের সাথে খুব সম্মানজনক ভাষায় কথা বলিও।"

(সুরা– বনী ইসরাঈল, আয়াত–২৩)

মাতার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী (সাঃ) মাতাপিতা সম্পর্কে আরো বলেন,

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ "মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, ওমরাহ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা হতেও উত্তম।"

মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন না বরং তাদেরকে এ পৃথিবীতেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল বলেন, "আল্লাহ সকল গুণাহই তার ইচ্ছামত ক্ষমা করে থাকেন কিন্তু মাতাপিতার অবাধ্যতার গুণাহ ক্ষমা করেন না বরং এ ধরনের গুণাহগারকে পার্থিব জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।"

অবাধ্য সন্তানের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে বিশ্বনবী (সাঃ) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন,

رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

অর্থাৎ "তার নাক ধূলায় ধুসরিত হউক, তার নাক ধূলায় ধুসরিত হউক, তার নাক ধূলায় ধুসরিত হউক (অর্থাৎ লাঞ্ছিত)। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসুল, কার? (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন?) তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যে মাতাপিতা উভয়কে কিংবা যে কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ বেহেস্ত লাভ করতে পারল না।" (সহী মুসলিম)

অর্থাৎ মাতাপিতার খেদমত তথা তাঁদের মর্যাদা ও অধিকার আদায়কে জান্নাত লাভের উপায় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এতক্ষণ মাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হল তা মাতার জীবিতাবস্থায়। অর্থাৎ মাতা যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকবেন, ততদিন সন্তানের নিকট মাতার এ সকল মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। মাতার প্রতি সন্তানের এ সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। মাতা যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলেও সন্তানের নিকট মাতার অধিকার এবং মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্বকে মহান আল্লাহ পাক সমাপ্ত করে দেননি, মাতার মৃত্যুর পরও তাঁর অধিকার রয়েছে; আর তাহল নেক দোয়া লাভ। মাতাপিতার মৃত্যুর পর

সন্তানের কর্তব্য হল মাতাপিতার জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করা। এ দোয়া সন্তান কিভাবে করবে তাও পবিত্র কোরআনে করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন সন্তানকে শিখিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের মাতাপিতার জন্যে এভাবে দোয়া কর–

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ۝

অর্থাৎ "তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি মাতাপিতার প্রতি সেরূপ করুণা কর যেরূপ (করুণা করে) তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছে। (সুরা– বনি ইসরাঈল, আয়াত–২৪)

হাদিস শরীফে হযরত উসাইদ আবু সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সালমা গোত্রের একজন লোক তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মাতাপিতার ইন্তেকালের পর আমার উপর তাঁদের এমন কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে কি যা আমার পক্ষে আদায় করা দরকার? আল্লাহর রাসুল (সাঃ) উত্তরে বললেন, হাঁ, তাঁদের জন্যে দোয়া কর, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা কর এবং তাঁদের বৈধ অছিয়তগুলো আদায় কর। জীবিত থাকাকালে যাদের সংগে মাতাপিতার বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা ছিল তাদের সংগে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখ এবং মাতাপিতার বন্ধুগণকে সম্মান ও আপ্যায়ন কর।

(আবু দাউদ শরীফ)

এমনিভাবে ইসলাম সন্তানের নিকট মাতা হিসেবে নারীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। মাতার মর্যাদা ও অধিকার শুধুমাত্র জীবিতাবস্থায়ই নয় বরং মৃত্যুর পরও রয়েছে।

আইয়্যামে জাহেলিয়াতে নারীদের সম্পর্কে যে অন্যায় ও অবিচারমূলক মতবাদ ও সিদ্ধান্ত কায়েম করা হয়েছিল, ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতা সেই ভ্রান্ত মতবাদকে শুধুমাত্র ধুলিস্যাৎই করেনি বরং নারীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও অধিকারকেও করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে এদেশের তথাকথিত এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী নারী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মায়া মরিচিকায় মুখরোচক শ্লোগান দিতে শুরু করেছে। তাদের ভাষায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারী জাতিকে নাকি তেমন কোন অধিকার দেয়া হয়নি। বাংলা ভাষায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কিত ভাল বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশিষ্ট আলেম ও লেখক, যার কলম অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সোচ্চার হযরত মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী সাহেব "ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ" নামক এ বইটি লিপিবদ্ধ করে একটি বড় অভাব পূরণ করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি তাঁর অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন হবে বলে মনে করি।

লেখক এ বইটিতে খুব সহজ ও সরল ভাষায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। এছাড়া উত্তরাধিকারীত্বে অন্যান্য ধর্মে নারীর যে অবস্থা তাও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নারীর অধিকার ও ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত অভিযোগেরও যুক্তিসহকারে জবাব দেয়া হয়েছে। লেখকের আকাঙ্খা, প্রত্যেক মুসলিম নরনারী এ বইটির মাধ্যমে ইসলাম প্রদত্ত তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। লেখকের এ আকাঙ্খা সফল বাস্তবায়িত হউক সে প্রত্যাশা নিয়ে পাঠকগণকে এ বইটি পাঠে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

প্রকাশক